মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণের সন্ধান পৃ. ০৫

প্রথমবারের মতো শুকরের ভ্রূণে মানব হৃদপিণ্ড তৈরি পৃ. ১১

এবার প্লাস্টিক থেকে তৈরি হবে প্যারাসিটামল ঔষধ পৃ. ৩৯

বিজ্ঞানবার্তা

সংখ্যা ১, ইস্যু ৪

জুন ২০২৫

ট্রাইফিড, লেগুন

সবচেয়ে বড় ক্যামেরায় তোলা ছবি?

পৃ. ২৩

সম্পাদক
তানভীর রানা রাব্বি

সহ-সম্পাদক
সাদিয়া ইসলাম

প্রচ্ছদ
NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

প্রকাশক
বিজ্ঞানবার্তা (bigganbarta.org)
তারিখ: ১১ জুলাই, ২০২৫
ইমেইল: editor@bigganbarta.org

@bigganbarta
@bigganbarta
@bigganbarta
@bigganbartafb
info@bigganbarta.org
bigganbarta.org

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকে না, প্রতিনিয়ত তার পথ বদলায়, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিজ্ঞানবার্তা-র এ সংখ্যায় আমরা এমন কিছু আবিষ্কারের কথা তুলে ধরেছি, যা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানকে আরও বিস্ময়কর করে তুলবে। মহাকাশে সবচেয়ে বড় ক্যামেরায় তোলা বিশাল এক চিত্র আমাদের স্থান-সময় ভাবনায় নতুন আলো ফেলেছে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণের সন্ধান মিলেছে যা সুপারনোভাকেও ছাপিয়ে গেছে। শুকরের ভ্রূণে মানব হৃদপিণ্ড তৈরি করে গড়েছে নতুন দিগন্ত, যা অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে। আর ওষুধশিল্পে, প্লাস্টিক থেকেই তৈরি হবে প্যারাসিটামল!

আমাদের লক্ষ্য, বিজ্ঞানকে জটিলতা নয়, গল্পের মতো সহজ ভাষায় পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া।

“বিজ্ঞানবার্তা”-র লক্ষ্য সবসময়ই ছিল বিজ্ঞানের জটিলতাকে সহজ ভাষায় সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রশ্ন, কৌতূহল আর গল্প, এই হোক জ্ঞানের আসল পথ।

— সম্পাদক

১০ জুলাই, ২০২৫

সূচীপত্র

অতিপরিবাহী

জুন মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

সংবাদ

০৪ গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সিলিকন মনোক্সাইড
০৫ মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ
০৭ টেকসই বিকল্প হতে পারে থোরিয়াম!
০৯ মস্তিষ্কে ইমপ্লান্ট বসিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর ফিরে পাওয়া
১১ শুকরের ভ্রূণে তৈরি হলো ক্ষুদ্র মানব হৃদপিণ্ড
১৬ আপনার নিঃশ্বাস আপনার পরিচয়ের ছাপ
১৭ ঘুমের ওপর মানসিক চাপের প্রভাব!
২২ নতুন রক্তের গ্রুপের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা
২৫ পারকিনসন রোগ শনাক্তে নতুন দিগন্ত
২৮ নতুন তত্ত্ব বলছে সময় তিন মাত্রার
২৯ ওয়েবের পর্যবেক্ষণ করা প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট
৩৩ কোষীয় জগতের এক নতুন রহস্য উন্মোচন
৩৪ চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ
৩৬ ডেনিসোভানদের রহস্যভেদ!
৩৯ প্লাস্টিক থেকে প্যারাসিটামল তৈরি
৪০ শুধুই বাবার জিন দিয়ে সন্তানের জন্ম

বিজ্ঞান ব্লগ

৪২ শূন্য দিয়ে ভাগ কেন বিপজ্জনক?
৪৪ প্রায় সব জীব কেন অক্সিজেন গ্রহণ করে?

ফিচার

১৩ আফ্রিকার মহাকাশযাত্রা
১৯ নিয়ানডার্থাল বিলুপ্তির নতুন তত্ত্ব

অন্যান্য

৩৭ কখন থেকে মেয়েরা গণিতে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে?

জ্যোতির্বিজ্ঞান

গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সিলিকন মনোক্সাইড

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা WASP-121b নামের এক এক্সোপ্ল্যানেটে দিনের পাশের বায়ুমণ্ডলে পানি, কার্বন মনোক্সাইড ও সিলিকন মনোক্সাইড এবং রাতের পাশের বায়ুমণ্ডলে মিথেন শনাক্ত করেছেন। এটিই এখন পর্যন্ত প্রথম কোনো গ্রহ (আমাদের সৌরজগতের গ্রহসহ) যার বায়ুমণ্ডলে সিলিকন মনোক্সাইড শনাক্ত হয়েছে।

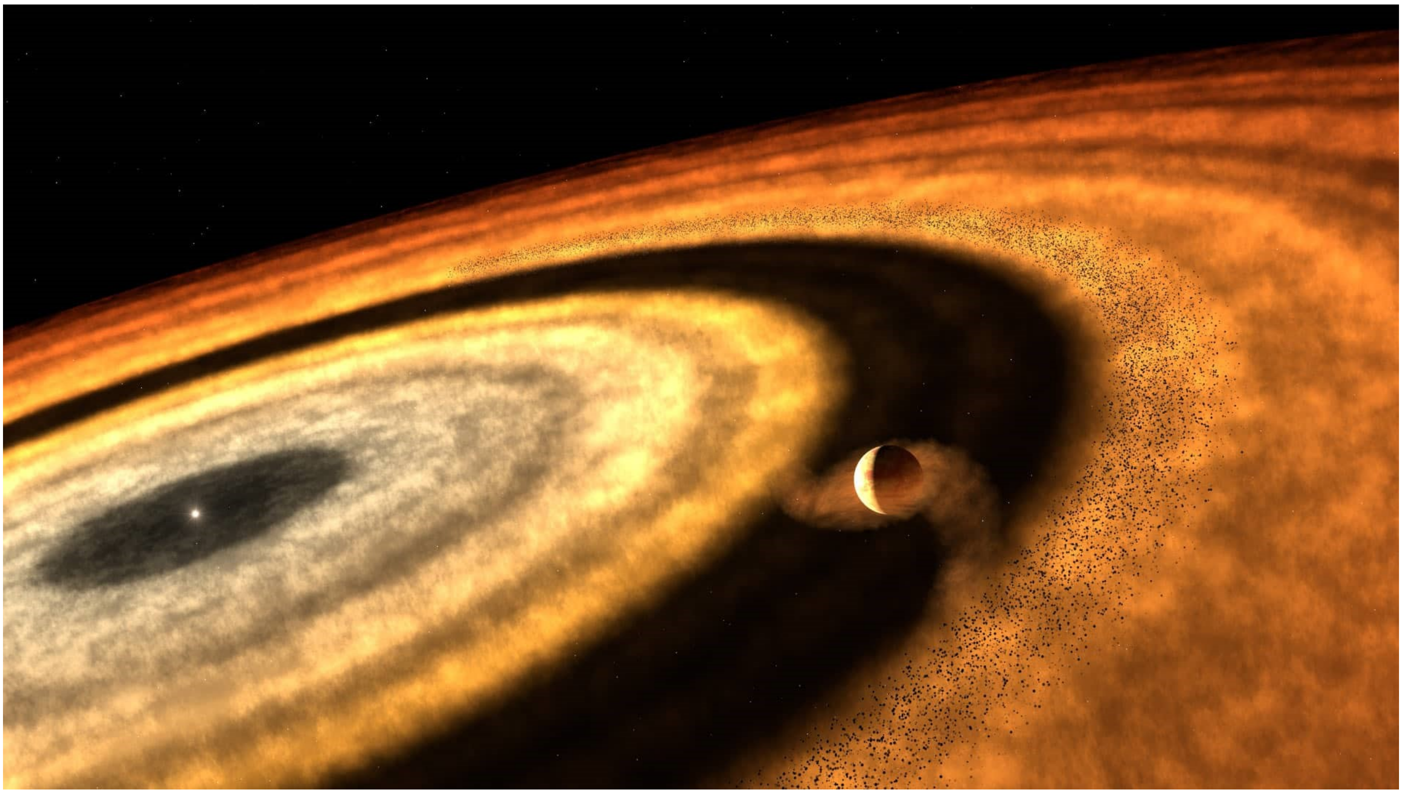

T. Müller/Max Planck Institute for Astronomy (MPIA)/Haus der Astronomie (HdA)

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন WASP-121b নামের এক অতি-উষ্ণ বৃহস্পতি সদৃশ এক্সোপ্ল্যানেটের বায়ুমণ্ডলে। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৮৮১ আলোকবর্ষ দূরে, Puppis নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো কোন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সিলিকন মনোক্সাইডের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করেছেন।

WASP-121b একটি বিশাল গ্যাসীয় গ্রহ, যা বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় ১.৮৭ গুণ বড় এবং ১.১৮ গুণ বেশি ভারী। ২০১৬ সালে WASP-South জরিপের মাধ্যমে এটি আবিষ্কৃত হয়। এটি WASP-121 (TYC 7630-352-1) নামক একটি F-টাইপ নক্ষত্রকে মাত্র ১.৩ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এতটাই কাছাকাছি কক্ষপথে রয়েছে যে, গ্রহটি তারার মহাকর্ষীয় টানে প্রায় ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম।

এই এক্সোপ্ল্যানেটটির তাপমাত্রা চরম মাত্রায় ওঠানামা করে। এর দিনের দিকে তাপমাত্রা ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি, আর রাতের দিকটি ঠান্ডা হয়ে নেমে যায় প্রায় ১৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই চরম পরিবেশ গবেষকদেরকে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে রাসায়নিক পরিবর্তন বোঝার সুযোগ দিয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে গ্যাসের ভার্টিকাল মিক্সিং ঘটে, অর্থাৎ নিচের স্তর থেকে গ্যাস উপরের দিকে উঠে আসে, বিশেষ করে রাতের দিকে। আশ্চর্যের বিষয়, ঠান্ডা অঞ্চলে মিথেনের কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা এত তাপমাত্রায় পাওয়ার কথা নয়।

গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং সিলিকনের অনুপাত বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এটি বরফাচ্ছাদিত পাথরের টুকরো (icy pebbles) ও উচ্চতাপে টিকে থাকা কঠিন পদার্থ (refractory compounds) এর সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। সাধারণত এ ধরনের কঠিন পদার্থ WASP-121b-এর অতিরিক্ত উষ্ণ দিনের দিকে গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'ফেজ কার্ভ পর্যবেক্ষণ' (phase curve observation) নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রহটির উজ্জ্বলতার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন, যেটি গ্রহটি তারার চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর সময় ঘটে। এর ফলে দিনের দিক ও রাতের দিকের রাসায়নিক গঠন আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

"এই গবেষণাটি ওয়েব টেলিস্কোপের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছে। এটি দূরবর্তী জগতের জটিল বায়ুমণ্ডলে একক অণু পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারে। এটি ভবিষ্যতের এক্সোপ্ল্যানেট গবেষণার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিকনির্দেশনা," বলেন ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহামের ড. অঞ্জলি পিয়েট।

এই আবিষ্কার শুধু অতি-উষ্ণ এক্সোপ্ল্যানেটগুলোর আচরণ বুঝতে সাহায্য করে না, বরং সৌরজগতের বাইরে ভিনগ্রহ অন্বেষণে পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশ দূরবীক্ষণের ক্ষমতাও প্রমাণ করে।

লেখক: ইরতা আমালিয়া
রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41550-025-02513-x

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ

গবেষকরা এক নতুন ধরনের মহাজাগতিক বিস্ফোরণের সন্ধান পেয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন Extreme Nuclear Transients (ENTs)। এটি ঘটে যখন বিশাল কোনো নক্ষত্র সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের খুব কাছে গিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় এবং বিপুল শক্তি ছাড়ে। ENTs সুপারনোভার চেয়ে বহু গুণ বেশি উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী। এই আবিষ্কার ব্ল্যাক হোল বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ও প্রাচীন মহাবিশ্ব নিয়ে নতুন ধারণা দিচ্ছে।

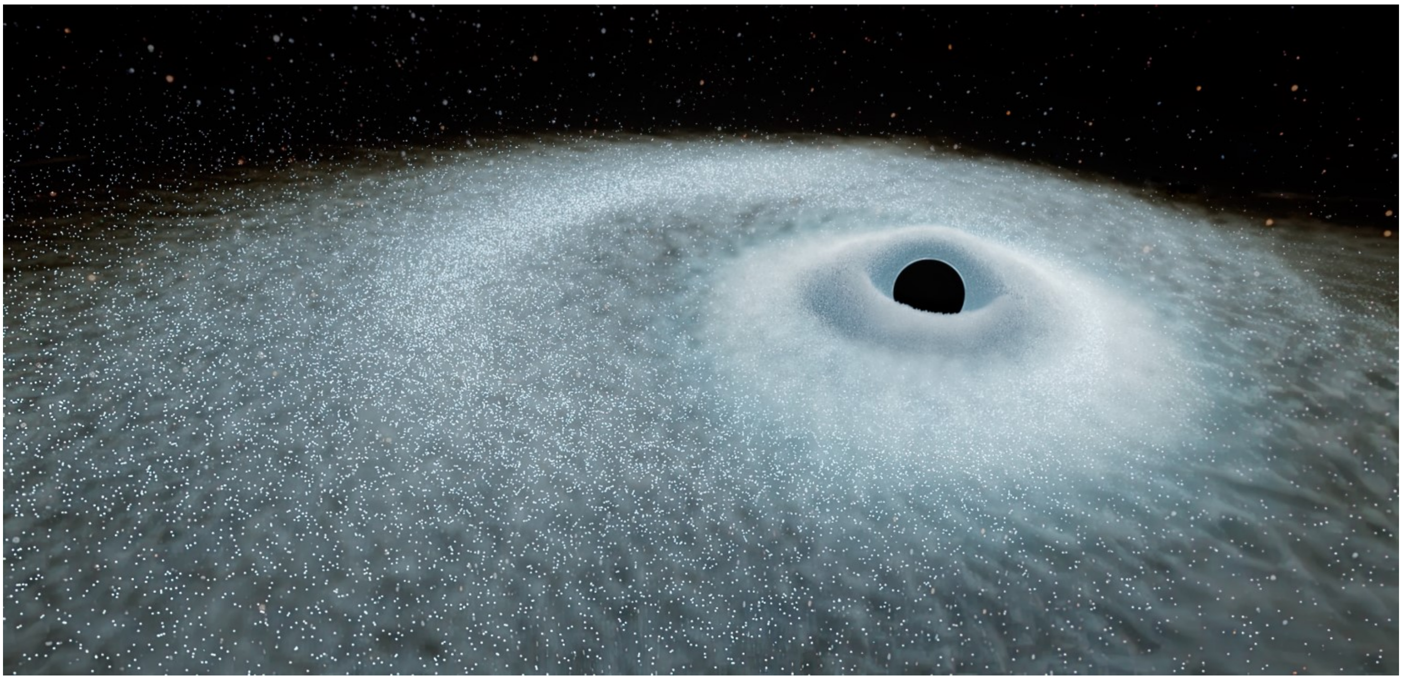

W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোনমি (IfA)-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজাগতিক বিস্ফোরণের খোঁজ পেয়েছেন। তারা এই নতুন ধরনের ঘটনাকে নাম দিয়েছেন "এক্সট্রিম নিউক্লিয়ার ট্রানজিয়েন্টস" (ENTs)। এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যখন সূর্যের চেয়ে অন্তত তিনগুণ ভারী নক্ষত্র এক বিশাল ব্ল্যাক হোলের খুব কাছাকাছি চলে গিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নির্গত হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি, যা অনেক দূর থেকেও দৃশ্যমান হয়।

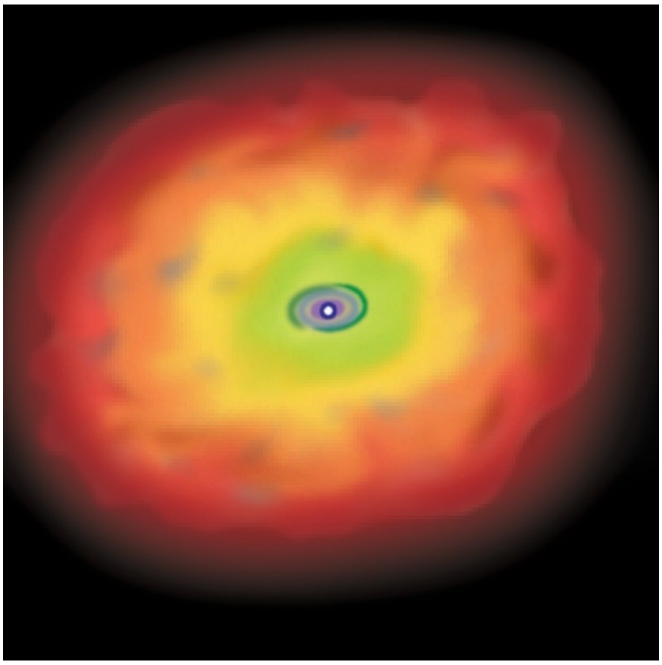

University of Hawai'i

গবেষণার প্রধান জেসন হিঙ্কল, বলেন, "আমরা গত এক দশক ধরে নক্ষত্রদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া, অর্থাৎ টাইডাল ডিসরাপশন ইভেন্ট (TDE) পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু ENTs একেবারেই আলাদা। এগুলোর উজ্জ্বলতা সাধারণ TDE-এর চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশি। শুধু যে ENTs অনেক বেশি উজ্জ্বল, তা-ই নয়—তারা বছরের পর বছর ধরে উজ্জ্বল থেকে যায়, এমনকি সবচেয়ে উজ্জ্বল সুপারনোভার শক্তিকেও ছাড়িয়ে যায়।"

এই ENTs-এর উজ্জ্বলতা ও শক্তি নজিরবিহীন। এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণকৃত সবচেয়ে শক্তিশালী ENT (যার নাম Gaia18cdj) সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারনোভার তুলনায় ২৫ গুণ বেশি শক্তি নিঃসরণ করেছে। যেখানে একটি সাধারণ সুপারনোভা এক বছরে সূর্যের ১০ বিলিয়ন বছরের সমান শক্তি ছড়ায়, সেখানে একটি ENT মাত্র এক বছরেই ১০০টি সূর্যের সমান শক্তি বিকিরণ করে।

এই ENTs প্রথম নজরে আসে যখন হিঙ্কল বিভিন্ন পাবলিক ট্রানজিয়েন্ট সার্ভের তথ্য খুঁজে দেখছিলেন দীর্ঘস্থায়ী ফ্লেয়ার খুঁজে পাবার জন্য, যেগুলো গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে আসছিল। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির Gaia মিশনের তথ্য ঘেঁটে তিনি দুটি অস্বাভাবিক ফ্লেয়ার শনাক্ত করেন, যেগুলো অনেক দীর্ঘ সময় ধরে উজ্জ্বল ছিল এবং প্রচলিত ট্রানজিয়েন্টের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সাথে মিল ছিল না।

এই আবিষ্কারের পর শুরু হয় বহু বছরের অনুসন্ধান। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, W. M. Keck Observatory, এবং বিশ্বের বিভিন্ন টেলিস্কোপের সহায়তায় গবেষক দলটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের বিভিন্ন অংশে তথ্য সংগ্রহ করে। কারণ ENTs ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, ফলে পুরো ঘটনাটি বুঝতে ধৈর্য ও দীর্ঘ সময় লেগেছে।

সম্প্রতি, Zwicky Transient Facility আরও একটি একই ধরনের ঘটনা আবিষ্কার করেছে, যা স্বাধীনভাবে দুটি গবেষক দল রিপোর্ট করেছে। এটি প্রমাণ করে যে ENTs একটি স্বতন্ত্র নতুন শ্রেণির এক্সট্রিম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা।

গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন, এই ENTs কোনো সুপারনোভা নয়, কারণ এরা যেকোনো পরিচিত নক্ষত্র বিস্ফোরণের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি ছাড়ে। তাদের দীর্ঘস্থায়ী ও মসৃণ আলো বিকিরণ দেখে গবেষকরা মনে করেন, এগুলোর মূল কারণ একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলে ধীরে ধীরে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র পতিত হওয়া, অর্থাৎ accretion।

তবে, ENTs-র আচরণ সাধারণ accretion-এর থেকে আলাদা। সাধারণ ব্ল্যাক হোল accretion-এ উজ্জ্বলতার ওঠানামা অনিয়মিত ও পূর্বানুমানহীন হয়। কিন্তু ENTs-র আলো মসৃণ এবং দীর্ঘস্থায়ী, যা একটি ভিন্ন ধরনের

পদার্থবিজ্ঞান নির্দেশ করে অর্থাৎ একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত তারার ধীরে ধীরে ব্ল্যাক হোলে পতন।

IfA-র সহযোগী অধ্যাপক ও গবেষণার সহ-লেখক বেনজামিন শ্যাপি বলেন, "ENTs আমাদের সুদূর গ্যালাক্সিগুলোর বিশাল ব্ল্যাক হোলগুলো অধ্যয়নের এক নতুন দারুণ হাতিয়ার দেয়। কারণ এরা এতটাই উজ্জ্বল যে মহাকাশের বিশাল দূরত্ব থেকেও দেখা যায়—আর জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরে দেখা মানেই অনেক আগের সময়ে দেখা।"

"এই দীর্ঘস্থায়ী আলো আমাদের জানায়, যখন মহাবিশ্ব তার বর্তমান বয়সের অর্ধেক ছিল, তখন ব্ল্যাক হোলগুলো কীভাবে বাড়ছিল। তখনকার গ্যালাক্সিগুলো ছিল বিশাল তারকা গঠনের কেন্দ্র এবং ব্ল্যাক হোলগুলোকে খাওয়াচ্ছিল বর্তমানের তুলনায় ১০ গুণ বেশি হারে।"

তবে ENTs অত্যন্ত বিরল ঘটনা—প্রতি ১০ মিলিয়নে মাত্র একটি, যা সুপারনোভার চেয়ে অনেক কম। তাই এদের শনাক্ত করা কঠিন এবং টানা মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতের Vera C. Rubin Observatory এবং NASA-এর Roman Space Telescope এর মতো পর্যবেক্ষণাগারগুলো আরও অনেক ENTs খুঁজে পাবে, যা আমাদের ব্ল্যাক হোল কার্যকলাপ এবং প্রাচীন মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা বদলে দেবে।

হিঙ্কল বলেন, "এই ENTs শুধু একটি বিশাল তারকার নাটকীয় মৃত্যু নয়। তারা এমন এক প্রক্রিয়া উদঘাটন করে, যা মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোলগুলোকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।"

লেখক: ইরতা আমালিয়া

রেফারেন্স: DOI: 10.1126/sciadv.adt0074

পদার্থবিজ্ঞান

টেকসই বিকল্প হতে পারে থোরিয়াম!

Negro Elkha/Adobe Stock

চীনের সিচুয়ান প্রদেশেবায়ান ওবো মাইনিং কমপ্লেক্সে সম্প্রতি ১ মিলিয়ন টন প্রাকৃতিক থোরিয়াম (Th-232) এর মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষকদের দাবি, এই পরিমাণ থোরিয়াম চীনের বিদ্যুতের চাহিদা আগামী ৬০ হাজার বছর পর্যন্ত

মেটাতে সক্ষম হবে। যদিও এটি একটি প্রাথমিক অনুমান, তবুও এই আবিষ্কার থোরিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানির সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর নতুন এই আবিষ্কার চীনের পূর্বঘোষিত আনুমানিক ১ মিলিয়ন টনের প্রমাণিত রিজার্ভকে কয়েক গুণ ছাড়িয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

থোরিয়াম (Thorium, সংকেত Th) একটি প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় মৌল, যেটি পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়ামের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা রাখে। প্রকৃতিতে এটি মূলত Th-232 আইসোটোপ আকারে পাওয়া যায়, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিউট্রন শোষণ করে ইউরেনিয়াম-২৩৩ তে রূপান্তরিত হতে পারে। ইউরেনিয়াম-২৩৩ একটি কার্যকর জ্বালানি উপাদান।

থোরিয়ামের অন্যতম বড় সুবিধা হলো, এটি পৃথিবীতে ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া, এর ব্যবহারে তুলনামূলকভাবে কম পারমাণবিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় এবং এটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য তেমন উপযোগী নয়, ফলে এটি নিরাপদ বলেই ধরা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বর্তমানে মোল্টেন সল্ট রিঅ্যাক্টর (MSR) প্রযুক্তির মাধ্যমে থোরিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহারের ওপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি টেকসই, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব (গ্রিন/ক্লিন) শক্তির উৎস হিসেবে সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত থোরিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় মৌল হলেও এর তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ইউরেনিয়ামের তুলনায় অনেকটাই কম। বিজ্ঞানীরা এটিকে পরিবেশবান্ধব, ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ বলে মনে করেন। তবে এটি সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য না হলেও Molten Salt Reactor (MSR)-এর মতো প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউট্রন শোষণ করে এটিকে ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ রূপান্তরিত করে কার্যকরী জ্বালানি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।

এই বিশেষ প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থোরিয়াম যথেষ্ট কম তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপন্ন করে এবং পারমাণবিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই হ্রাস করবে মনে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। এই প্রযুক্তি নিয়ে আমেরিকা, চীন এবং ভারতের মতো দেশ নিবিড়ভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন চালিয়ে গেলেও তা এখনো পর্যন্ত পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রমাণিত বৃহত্তম থোরিয়াম মজুদ রয়েছে ভারতে (প্রায় ৮.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন)। ভারতের পাশাপাশি ব্রাজিল (৬.৩ লক্ষ টন), অস্ট্রেলিয়া (৫.৯ লক্ষ টন) এবং যুক্তরাষ্ট্র (৪০ হাজার টন) থোরিয়াম মজুত থাকতে পারে। তবে চীনের এই নতুন আবিষ্কৃত প্রায় ১ মিলিয়ন টন থোরিয়ামের মজুত বৈশ্বিক পর্যায়ে দেশটির অবস্থানকে হয়ত আরো শক্তিশালী করবে।

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন যে, সীমিত পর্যায়ের তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম উপাদান থেকে সরাসরি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা যায় না, তাই এটিকে 'নন-প্রোলিফারেশন' জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে থোরিয়ামের বাণিজ্যিক ব্যবহার একেবারেই সীমিত হলেও গবেষণার জন্য বিশুদ্ধ থোরিয়াম অক্সাইড (ThO_2) আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি ৩,০০০ থেকে ১০,০০০ ডলারে বিক্রি হতে পারে।

বর্তমানে থোরিয়াম ভিত্তিক জ্বালানি গবেষণায় বৈশ্বিক পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে রয়েছে চীন। দেশটি মূলত লিকুইড ফ্লোরাইড থোরিয়াম রিঅ্যাক্টর (LFTR) প্রযুক্তির উন্নয়নে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। গত ২০২১ সালে গোবি মরুভূমিতে একটি পরীক্ষামূলক উচ্চ প্রযুক্তির Molten Salt Reactor (MSR) সিস্টেম চালু করে। যা self-regulating system হিসেবে কাজ করে এবং core meltdown বা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ঝুঁকি কম বলে দাবি করা হয়।

বৈশ্বিক পর্যায়ে থোরিয়াম মৌল মজুতের দিক দিয়ে ভারত থোরিয়াম সুপারপাওয়ার হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। বিশেষ করে ভারতের কেরালা রাজ্যে এই উপাদানের বিশাল মজুদ রয়েছে। দেশটি তার Advanced Heavy Water Reactor (AHWR) প্রযুক্তি নিয়ে নিবিড়ভাবে গবেষণা

চালিয়ে যাচ্ছে। যা অদূর ভবিষ্যতে থোরিয়াম ভিত্তিক জ্বালানি শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সীমিত পর্যায়ের তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম ভিত্তিক জ্বালানি কার্বন নিঃসরণ কমাতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে ঝুঁকিমুক্ত ও টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আগামী ২০৬০ সালের মধ্যে নেট-জিরো কার্বন নিঃসরণ অর্জনের লক্ষ্যে এবং টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চীন এই প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

যদিও এখনো পর্যন্ত থোরিয়াম প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে। এটি ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে প্রত্যাশা করেন বিজ্ঞানীরা। তবে যাই হোক না কেন, এর ব্যাপক উন্নয়ন ও গবেষণা এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন অবশ্যই আন্তর্জাতিক পারমাণবিক নিরাপত্তা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তার পাশাপাশি এই অভাবনীয় ও অতি সম্ভাবনাময় জ্বালানির উৎস যাতে সারা বিশ্বের মানব কল্যাণে ব্যবহার হয় তা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, থোরিয়াম ভিত্তিক জ্বালানি ব্যবস্থা এখন কেবল আর গবেষণার বিষয় নয়, এটি ভবিষ্যতের ক্লিন এনার্জি-এর একটি শক্তিশালী এবং সম্ভাবনাময় বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। চীনের মতো দেশগুলোর উদ্যোগ এবং ইনোভেটিভ আইডিয়া এই খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে, যা অদূর ভবিষ্যতে হয়ত সারা বিশ্বে নিরাপদ জ্বালানি ব্যবস্থার এক নতুন বিপ্লব সূচনা করতে পারে।

লেখক: সিরাজুর রহমান

প্রযুক্তি

মস্তিষ্কে ইমপ্লান্ট বসিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর ফিরে পাওয়া

মস্তিষ্কে ইমপ্লান্ট বসিয়ে গুরুতর বাক্-অক্ষম এক ব্যক্তি কথা বলা ও গান গাওয়ার সক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। এই ব্রেইন–কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তার মস্তিষ্কের সংকেত তাৎক্ষণিকভাবে ভাষায় রূপান্তর করে, যা স্বর ও আবেগ প্রকাশও করতে সক্ষম।

BrainGate–এর গবেষক মৈত্রেয়ী ওয়াইরাগকর এবং ক্যারিনা ইয়াকোব্যাচি মস্তিষ্কের স্নায়ু সংকেত বিশ্লেষণ করছেন (UC Davis)

একজন গুরুতর বাক্-অক্ষম ব্যক্তি এখন কথা বলতে পারছেন, এমনকি গানও গাইতে পারছেন একটি মস্তিষ্কে বসানো ইমপ্লান্টের সাহায্যে, যা তার স্নায়ুতে সৃষ্ট সংকেতগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে ভাষায় রূপান্তর করছে। এই ডিভাইসটি তার কথার স্বরে ওঠানামা, জোর দিয়ে বলা শব্দ এবং তিনটি ভিন্ন স্বরে সুর তুলে গুনগুন করাও প্রকাশ করতে পারে।

এই প্রযুক্তিকে বলা হয় ব্রেইন–কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI)। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীর মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সংকেত বিশ্লেষণ করে যখন তিনি কথা বলার চেষ্টা করেন। এটি প্রথম ডিভাইস যা শুধু কথাই নয়, বরং স্বাভাবিক বাক্যের স্বর, পিচ এবং জোরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও পুনর্গঠন করতে পারে—যেগুলো কথার টোন এবং আবেগ প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একটি গবেষণায় দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীর কণ্ঠ অনুকরণ করে তৈরি করা কৃত্রিম কণ্ঠ তার কথা বলার ইচ্ছার সংকেত পাওয়ার মাত্র ১০ মিলিসেকেন্ডের মধ্যেই শব্দ উচ্চারণ করে ফেলেছে। *Nature* জার্নালে প্রকাশিত এই সিস্টেমটি পূর্ববর্তী প্রযুক্তিগুলোর তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। আগের প্রযুক্তি সম্পূর্ণ বাক্য ঠোঁট নাড়ানোর ৩ সেকেন্ডে পর কথা বা শব্দ তৈরি করত, সেখানে এটি তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট শব্দ তৈরি করতে পারে।

রিয়েল-টাইম ডিকোডার

৪৫ বছর বয়সী এই অংশগ্রহণকারী অ্যামিওট্রফিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস (ALS) রোগে আক্রান্ত হয়ে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এটি একটি মোটর নিউরন রোগ, যা মাংসপেশির নড়াচড়ার জন্য দায়ী স্নায়ুগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি শব্দ করতে ও ঠোঁট নাড়াতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু তার কথা ছিল ধীরগতির ও অস্পষ্ট।

রোগের পাঁচ বছর পর তার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ২৫৬টি সিলিকন ইলেকট্রোড বসানো হয়, প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১.৫ মিলিমিটার। এই ইলেকট্রোডগুলো মস্তিষ্কের এমন একটি অঞ্চলে বসানো হয় যা শারীরিক নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষক মৈত্রেয়ী ওয়াইরাগকর ও তার দল এক ডিপ-লার্নিং অ্যালগরিদম তৈরি করেন যা প্রতি ১০ মিলিসেকেন্ডে মস্তিষ্কের সংকেত বিশ্লেষণ করে অংশগ্রহণকারীর উচ্চারণের চেষ্টা করা শব্দগুলো রিয়েল-টাইমে ডিকোড করতে পারে। তারা সরাসরি শব্দ শনাক্ত করেন, কোনো নির্দিষ্ট শব্দ বা ধ্বনির ইউনিট (ফোনিম) নয়।

ওয়াইরাগকর বলেন, "মানুষ সব সময় শব্দ ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করে না। কখনো 'আহ', 'উঁহ', 'হুম' জাতীয় আন্তঃক্ষেপণ বা শব্দহীন আবেগপূর্ণ আওয়াজ দিয়েও যোগাযোগ করে। তাই আমরা এমন একটি পদ্ধতি বেছে নিয়েছি যা কোনো শব্দভাণ্ডারে সীমাবদ্ধ নয়।"

তাদের AI অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণের জন্য রোগীর অসুস্থ হওয়ার আগের সাক্ষাৎকারের রেকর্ড ব্যবহার করে তার কণ্ঠের মতো একটি কৃত্রিম কণ্ঠ তৈরি করা হয়।

UC Davis

গবেষকরা অংশগ্রহণকারীকে অনুরোধ করেন 'আহ', 'উঁহ' ও 'হুম' জাতীয় ধ্বনি এবং কিছু বানানো শব্দ বলার জন্য। এইসব ধ্বনি BCI সফলভাবে তৈরি করতে পেরেছে, যা প্রমাণ করে যে এটি নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডার ছাড়াও কাজ করতে সক্ষম।

বাক-স্বাধীনতা ফেরা

ডিভাইসটি ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারী শব্দ বানাতে, খোলামেলা প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং নিজের ইচ্ছামতো কথা

বলতে পারছেন। ডিকোডারটি এমন কিছু শব্দও উচ্চারণ করতে পারছে যা ডিকোডার নিজে আগে শেখেনি। তিনি গবেষকদের বলেন, কৃত্রিম কণ্ঠে নিজের কথা শুনে তিনি "খুশি" এবং এটি "নিজের আসল কণ্ঠ" বলেই মনে হয়েছে।

আরেকটি পরীক্ষায় দেখা যায়, ডিভাইসটি বুঝতে পেরেছে তিনি কোনো বাক্য প্রশ্ন হিসেবে বলছেন, না কি সাধারণ বক্তব্য হিসেবে। এটি একই বাক্যে কোন শব্দে তিনি জোর দিচ্ছেন, তাও শনাক্ত করে কণ্ঠের স্বরসঙ্গত পরিবর্তন করতে পেরেছে। ওয়াইরাগকর বলেন, "মানব কণ্ঠের এইসব গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা এখানে এনেছি।" আগের প্রযুক্তি কেবল একঘেয়ে, ম্লান কণ্ঠই তৈরি করতে পারত।

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোইঞ্জিনিয়ার সিলভিয়া মারচেসোত্তি বলেন, "এটি প্রযুক্তিতে এক নতুন ধারা। ভবিষ্যতে রোগীদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার উপযোগী একটি বাস্তব টুলে রূপ নিতে পারবে এই সিস্টেম।"

লেখক: নুজহাত সুবাহ ঐশী

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41586-025-09127-3

জীববিজ্ঞান

শুকরের ভ্রূণে তৈরি হলো ক্ষুদ্র মানব হৃদপিণ্ড

গবেষকরা প্রথমবারের মতো শুকরের ভ্রূণে মানব কোষ দিয়ে ছোট হৃদপিণ্ড তৈরি করেছেন, যা ২১ দিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলো। ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি মানুষের জন্য অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সংকট দূর করতে সাহায্য করতে পারে। তবে এখনও এটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

Daniel Sambraus/Science Photo Library

গবেষকরা প্রথমবারের মতো শুকরের ভ্রূণে এমন হৃদপিণ্ডও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে মানব কোষ রয়েছে। এই ভ্রূণগুলো ২১ দিন পর্যন্ত বেঁচে ছিল এবং সেই সময়ের মধ্যেই তাদের ছোট্ট হৃদপিণ্ড হার্টবিট তৈরি করতে শুরু করে। এই গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি হংকংয়ে অনুষ্ঠিত International Society for Stem Cell Research–এর বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়।

মানব-প্রাণীর সংকর ভ্রূণ (chimaera) তৈরি করে বিজ্ঞানীরা এমন প্রাণী তৈরি করতে চান যাদের দেহে মানব অঙ্গ তৈরি হবে, ভবিষ্যতে যা মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপনযোগ্য হতে পারে। এটি বিশ্বজুড়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ঘাটতি মোকাবেলার একটি সম্ভাব্য সমাধান।

এই চিমেরা তৈরির একটি কৌশল হলো, প্রাণীর ভ্রূণে এমন কিছু জিন বাদ দেওয়া যা একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ (যেমন: হৃদপিণ্ড) তৈরির জন্য জরুরি। এরপর তাতে মানব স্টেম সেল (stem cell) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে প্রাণীর বদলে মানুষের কোষ দিয়ে ওই অঙ্গটি গঠিত হয়। আগেও বিভিন্ন গবেষক শুকরের ভ্রূণে মানব পেশি, বৃক্ক এবং রক্তনালীর কোষ তৈরি করেছেন এই পদ্ধতিতে।

গবেষণাটির নেতৃত্ব দেয়া গুয়াংজৌ ইনস্টিটিউটস অব বায়োমেডিসিন অ্যান্ড হেলথ–এর ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিস্ট লাই লিয়াংশুয়ে জানান যে, শুকরের অঙ্গগুলোর আকার ও গঠন মানুষের মতো হওয়ায়, তারা আদর্শ দাতা প্রাণী। এর আগে তার দল শুকরের ভ্রূণে প্রাথমিক পর্যায়ের মানব কিডনি গঠন করেছিল, যা গর্ভবতী শুকরের দেহে এক মাস পর্যন্ত টিকে ছিল। এবার তারা দেখতে চেয়েছেন একই কাজ হৃদপিণ্ডের ক্ষেত্রেও সম্ভব কি না।

এই গবেষণাটি এখনো পিয়ার রিভিউ করা হয় নি। গবেষণায়, লাই ও তার দল মানব স্টেম সেলকে শুকরের দেহে টিকে থাকার উপযোগী করে তোলে কিছু জিন যোগ করে, যা কোষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এবং বৃদ্ধি বাড়ায়। এরপর শুকরের এমন ভ্রূণ তৈরি করা হয়, যেখানে হৃদপিণ্ডের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ দুটি জিন মুছে ফেলা হয়। এরপর নিষিক্ত হওয়ার অল্প সময় পরের একটি পর্যায়ে (মরুলা) কিছু মানব স্টেম সেল এই ভ্রূণগুলোতে প্রবেশ করানো হয়। পরে এই ভ্রূণগুলো প্রতিস্থাপন করা হয় প্রতিস্থাপনকারী (surrogate) শুকরদের গর্ভে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ভ্রূণগুলো ২১ দিন পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে, তারপর তারা মারা যায়। লাই মনে করেন, সম্ভবত মানব কোষগুলো শুকরের হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

যখন গবেষকরা এই ভ্রূণীয় হৃদপিণ্ডগুলো কাছ থেকে পরীক্ষা করেন, তখন দেখা যায় এগুলো সেই পর্যায়ের একটি মানব হৃদপিণ্ডের সমান আকারে বেড়ে উঠেছে যা আঙুলের ডগার মতো। এবং সেগুলো স্পষ্টভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। মানব কোষগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ সেগুলোতে আগেই আলোকোজ্জ্বল (luminescent) একটি চিহ্ন যোগ করা হয়েছিল, যা আলো ছড়াচ্ছিল।

তবে হৃদপিণ্ডের কত শতাংশ কোষ মানব কোষ ছিল, তা গবেষকেরা প্রকাশ করেননি। আগের গবেষণায়, যেখানে শুকরের ভ্রূণে মানব কিডনি তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে ৪০–৬০% কিডনির টিস্যু মানব কোষ দিয়ে তৈরি হয়েছিল; বাকি অংশ ছিল শুকরের।

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্টেম-সেল জীববিজ্ঞানী হিরোমিৎসু নাকাউচি বলেন, হৃদপিণ্ডের কোষগুলো সত্যিই মানব কোষ কি না, তা নিশ্চিত করতে হলে ডেটা আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। চিমেরা গবেষণার একটি কমন চ্যালেঞ্জ হলো, মানব কোষে অন্য প্রজাতির কোষ মিশে যাওয়ার ঝুঁকি।

জাপানের ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, টোকিও'র স্টেম-সেল বিজ্ঞানী হিদেকি মাসাকি জানান, এই আলো ছড়ানো কোষগুলো হৃদপিণ্ডের খুব সীমিত অংশেই ছিল, তাই এগুলো প্রাণীর কোষের সাথে কতটা সংহত হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। যদি হৃদপিণ্ড অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য তৈরি করা হয়, তাহলে সেটি পুরোপুরি মানব কোষ দিয়ে তৈরি হওয়াই জরুরি, নইলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেটিকে বিদেশি বস্তু হিসেবে আক্রমণ করতে পারে।

লেখক: সাফিয়া তাবাসসুম রুমু

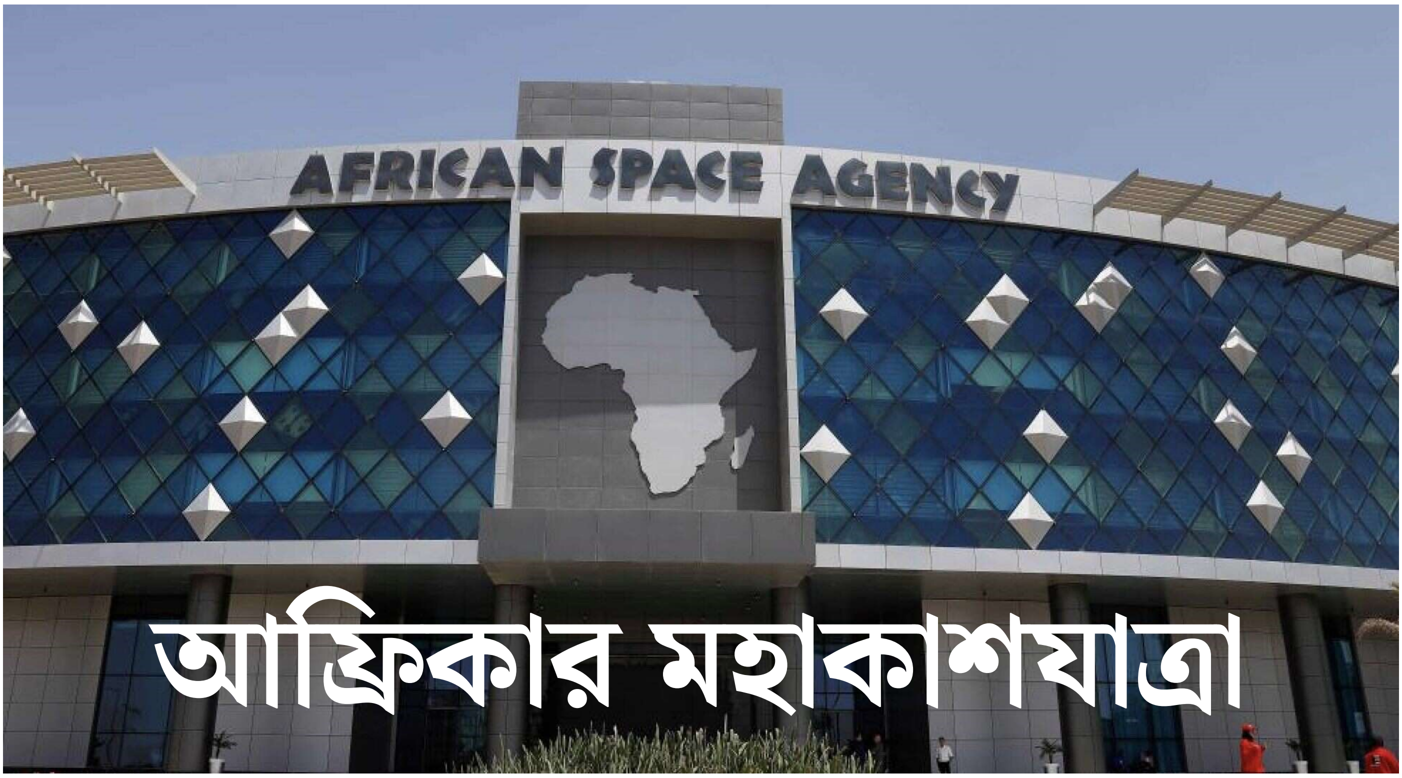

আফ্রিকার মহাকাশযাত্রা

আফ্রিকার প্রথম কন্টিনেন্ট-ওয়াইড মহাকাশ সংস্থা, আফ্রিকান স্পেস এজেন্সি (AfSA), ২০২৫ সালের এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। এজেন্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩ সালে আফ্রিকান ইউনিয়ন দ্বারা। বর্তমানে এর প্রথম প্রকল্প চালু হওয়ার প্রাক্কালে অর্থায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

এই সংস্থাটি গঠিত হয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়নের (AU) ৫৫টি সদস্য রাষ্ট্রের একটি উদ্যোগ হিসেবে। এর প্রধান কার্যালয় রয়েছে মিশরের কায়রো শহরে। আফসা (AfSA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান মহাকাশ কার্যক্রমগুলোর সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে। উল্লেখযোগ্যভাবে, বর্তমানে আফ্রিকার ২০টিরও বেশি দেশে মহাকাশ কর্মসূচি চালু আছে।

সংস্থার মূল অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে স্যাটেলাইট যোগাযোগের উন্নয়ন, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংযোগ নিশ্চিত করে। সেই সঙ্গে, মহাকাশ থেকে সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্যের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি সহায়তা এবং খাদ্য ও পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও AfSA-এর লক্ষ্য।

তবে এজেন্সিটি এখনও পুরোপুরি জনবল-সম্পন্ন নয়, এবং এর নির্দিষ্ট কর্মসূচি, বাজেট এবং অর্থায়নের উৎস এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। AfSA-এর মূল অর্থায়ন আসবে আফ্রিকান ইউনিয়নের বাৎসরিক বাজেট থেকে, যা ২০২৪ সালে ছিল ৬০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে সংস্থাটি অতিরিক্তভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকেও অর্থ সংগ্রহ করবে বলে জানিয়েছেন আফসার মহাকাশ প্রকৌশলী মেশ্যাক কিনুয়া ন্দিরিতু (Meshack Kinyua Ndiritu)। তিনি আরও বলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নধারায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন অগ্রাধিকার নির্ধারণ করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

নাইজেরিয়ার লাগোস ভিত্তিক মার্কেট রিসার্চ প্রতিষ্ঠান Space in Africa-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে আফ্রিকার দেশগুলোর সম্মিলিত মহাকাশ বাজেট ছিল ৪৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি বিশ্বব্যাপি মহাকাশ ব্যয়ের ১ শতাংশেরও কম হলেও ২০১৮ সাল থেকে এ খাতে

বাজেটের পরিমাণ ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইতিবাচক প্রবণতা নির্দেশ করে।

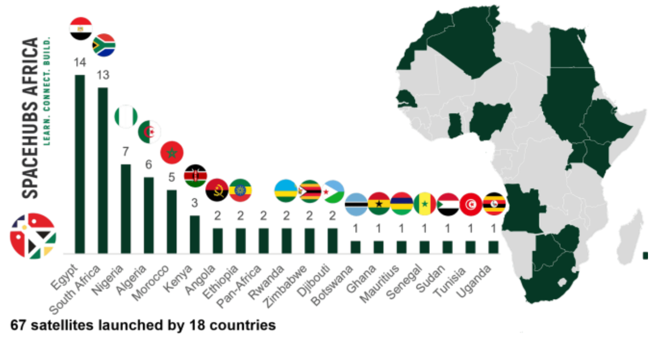

১৯৯৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ ৬০টিরও বেশি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করেছে (Spacehubs Africa)

২০২৫ সালের ২০ এপ্রিল AfSA-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ESA), রাশিয়ার রসকসমস (Roscosmos) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহাকাশ সংস্থা (UAE Space Agency) সংস্থাটির সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রও তাদের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল অনুষ্ঠানে।

AfSA-এর প্রথম যৌথ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা–ইউরোপ মহাকাশ কোলাবোরেশন, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত চার বছর মেয়াদি ৪৫ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ৫১ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের একটি প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য আফ্রিকা ও ইউরোপ অঞ্চলের মধ্যে মহাকাশ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও আফ্রিকার মহাকাশ প্রযুক্তির পরিবেশ শক্তিশালী করা।

"২০২৪ সালে আফ্রিকার দেশগুলোর সম্মিলিত মহাকাশ বাজেট ছিল ৪৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি বিশ্বব্যাপি মহাকাশ ব্যয়ের ১ শতাংশেরও কম"

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (MIT) মহাকাশ প্রকৌশলী ড্যানিয়েল উড (Danielle Wood) বলেন, AfSA-এর উচিত হবে বৈশ্বিক পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ার পাশাপাশি আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ অগ্রাধিকারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চীন বহুদিন ধরেই আফ্রিকার জাতীয় মহাকাশ সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করছে এবং আফ্রিকার মহাকাশ খাতে তাদের সম্পৃক্ততা দিন দিন বাড়ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চীনা রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো আফ্রিকায় বিদেশি স্যাটেলাইট চুক্তির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জিতেছে, যার আর্থিক মূল্য ছিল ৮৭১.৫ মিলিয়ন ডলার। এটি ফ্রান্সের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর চেয়ে তিনগুণ বেশি।

ODI Global নামক লন্ডনভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাংকের চীন বিশেষজ্ঞ রেবেকা নাদিন (Rebecca Nadin) বলেন, চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো আফ্রিকার বিভিন্ন মহাকাশ প্রকল্পে ঋণ দিয়েছে। চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো আফ্রিকার জন্য যোগাযোগ ও রিমোট-সেন্সিং স্যাটেলাইট তৈরি ও উৎক্ষেপণ করেছে এবং বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নেও অর্থায়ন করেছে। তার মতে, ভবিষ্যতে এই সম্পৃক্ততা আরও বাড়বে।

২০২৩ সালে মিশরকে রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট এমআইএসআরস্যাট-২ পাঠাতে সহায়তা করেছিল চীন (Wang Jiangbo/Xinhua/Getty Images)

তিনি আরও সতর্ক করেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল থেকে সরে দাঁড়ায়, তবে এর প্রভাব পড়বে আফ্রিকার মহাকাশ কর্মসূচির উপর। আফসার প্রকৌশলী ন্দিরিতু বলেন, "আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে, এবং আমাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন ও সৃজনশীল পথ খুঁজে বের করতে হবে।"

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাসা আফ্রিকান প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অনেক যৌথ প্রকল্পে কাজ করছে,

তবে রেবেকা নাদিনের মতে, এই প্রচেষ্টা চীনের তুলনায় কম সংগঠিত ও কৌশলগতভাবে দুর্বল। তিনি বলেন, চীন আফ্রিকাকে একটি বাণিজ্যিক অংশীদার ও তাদের মহাকাশসেবা বিক্রির বাজার হিসেবে দেখে।

আফ্রিকার মহাকাশ কর্মসূচির ইতিহাস বেশ পুরনো, কিছু দেশের উদ্যোগ কয়েক দশকের পুরনো। এগুলোর বেশিরভাগই স্যাটেলাইট (যোগাযোগ ও রিমোট-সেন্সিং) ভিত্তিক। মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকা ১২টিরও বেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে, এবং অনেক দেশে রয়েছে স্যাটেলাইট ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও গ্রাউন্ড স্টেশন। তবে স্বল্পসংখ্যক দেশেরই স্যাটেলাইট উৎপাদনের সক্ষমতা আছে এবং অধিকাংশ এখনও বিদেশি উৎক্ষেপণ প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। AfSA যদিও স্যাটেলাইটকেই প্রাধান্য দিচ্ছে, তবে মহাকাশ অভিযানে অংশগ্রহণ একেবারে বাতিল করে দিচ্ছে না। ন্দিরিতু বলেন, "আমরা দৌড়ানোর আগে হাঁটতে শিখতে চাই।"

MIT-এর ড্যানিয়েল উড বলেন, AfSA-এর একটি মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা জোরদার করা, যাতে অভিজ্ঞ দেশগুলো কম অভিজ্ঞ দেশগুলোর সঙ্গে নলেজ ভাগাভাগি করতে পারে এবং আঞ্চলিক চাহিদাগুলো পূরণে একযোগে কাজ করা যায়। এতে দিনে দিনে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, "এটি একটি নতুন যুগ। যেখানে আগে মনে হতো সুযোগগুলো কেবল আফ্রিকার বাইরে, এখন আমরা বলতে পারি—আফ্রিকার ভেতরেই রয়েছে অসংখ্য নতুন সুযোগ।"

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

স্বাস্থ্য

আপনার নিঃশ্বাস আপনার পরিচয়ের ছাপ

গবেষকরা দেখেছেন, একজন মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার ধরন তার নিজস্ব পরিচয় এবং মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত দিতে পারে। একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার নিঃশ্বাস বিশ্লেষণ করে তারা উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও শরীরের গঠনের সঙ্গে নিঃশ্বাসের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন।

যেভাবে প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ আলাদা, সেভাবেই একজন মানুষের নিঃশ্বাস নেয়ার ধরনও হতে পারে একান্তই তার নিজের। শুধু পরিচয় শনাক্ত করার উপায় হিসেবেই নয়, বরং একজনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বোঝার ইঙ্গিতও দিতে পারে এই নিঃশ্বাসের ছন্দ।

গবেষকরা ৯৭ জন সুস্থ মানুষের নিঃশ্বাস ২৪ ঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করেন। তারা দেখতে পান, শুধুমাত্র নিঃশ্বাসের ধরন দেখেই অংশগ্রহণকারীদের বেশ নিখুঁতভাবে শনাক্ত করা যায়। শুধু তাই নয়, এসব নিঃশ্বাসের ছন্দের সঙ্গে শরীরের ওজনের সূচক (BMI) এবং মানসিক অবসাদ বা উদ্বেগের লক্ষণের সম্পর্কও খুঁজে পান তারা। তাদের এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে *Current Biology* জার্নালে।

নিঃশ্বাস ও মস্তিষ্কের যোগসূত্র

প্রতিটি নিঃশ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়া মস্তিষ্কের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ, শরীরের সঠিক কার্যক্রম বজায় রাখতে মস্তিষ্ককে অক্সিজেন সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। গবেষকরা ভাবলেন, যেহেতু প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্ক আলাদা, তবে নিঃশ্বাসের ধরনও তো ভিন্ন হওয়ার কথা!

"ঘুমের সময় নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সঠিকভাবে ব্যাক্তি শনাক্তকরণের হার দাঁড়ায় ৯৬.৮ শতাংশ"

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তারা এমন একটি পরিধানযোগ্য যন্ত্র বানান যা ব্যক্তির দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবাহিত বাতাস রেকর্ড করতে পারে। গলার পেছনে লাগানো এই ডিভাইসে ছোট টিউব থাকে যা নাকের নিচে বসানো হয় এবং এটি মানুষের ঘুম ও জাগরণ—উভয় অবস্থায় নিঃশ্বাসের ধরন রেকর্ড করে।

গবেষকরা নিঃশ্বাসের ছন্দ বিশ্লেষণে ২৪টি সূচক ব্যবহার করেন, যেমন নিঃশ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সময়কাল, এবং দুই নাকের ফুটা দিয়ে বাতাস প্রবাহের পার্থক্য। ঘুম ও জাগরণকালীন তথ্য আলাদা করে একটি মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমকে প্রশিক্ষণ দেন তারা।

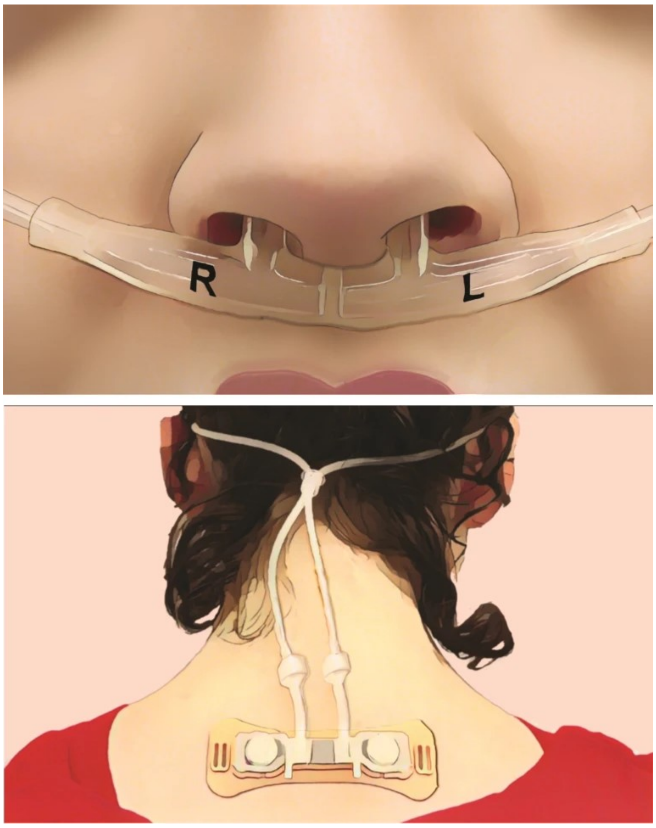

গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের ২৪ ঘণ্টার নিঃশ্বাসের ধরন পরিমাপ করেছেন একটি বিশেষভাবে তৈরি যন্ত্র ব্যবহার করে যা গলার পেছনে বসানো হয় (Soroka et al.)

এরপর ৪২ জন অংশগ্রহণকারী কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস বা এমনকি দুই বছর পর পুনরায় ২৪ ঘণ্টার নিঃশ্বাস

পরিমাপের জন্য আসেন। তখন ওই অ্যালগরিদম তাদের নিঃশ্বাসের ধরন থেকেই তাদের চিহ্নিত করতে পারে। জাগরণকালীন নিঃশ্বাসের তথ্য ঘুমকালীন চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ফল দেয়। যখন ২৪ সূচকের বদলে ১০০ সূচকে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন সঠিক শনাক্তকরণের হার দাঁড়ায় ৯৬.৮ শতাংশ।

নিঃশ্বাস বলছে স্বাস্থ্যের কথা

গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের BMI এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্নপত্র পূরণ করান। বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই তথ্যগুলোর সঙ্গেও নিঃশ্বাসের ধরন মিলে যায়, যদিও বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর মানসিক সমস্যা ছিল খুবই সামান্য।

যেমন, যাদের BMI বেশি, তাদের ঘুমকালীন নিঃশ্বাস অন্যদের চেয়ে আলাদা ছিল। আবার যাদের মধ্যে উদ্বেগ বা বিষণ্নতার মান বেশি, তাদের নিঃশ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার ধরণেও ছিল পার্থক্য।

স্টকহোমের কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের স্নায়ুবিজ্ঞানী আর্টিন আর্শামিয়ান এই গবেষণাকে বলেন, “অসাধারণ এক গবেষণা।”

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হেলেন লাভরেটস্কি বলেন, “আমাদের হাতে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী একটি টুল হচ্ছে নিঃশ্বাস।” উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর কিছু শাখায় সৈনিকদের চাপ সামলাতে এবং মনোসংযোগ ধরে রাখতে নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ শেখানো হয়।

গবেষক দলটি এখন খুঁজছেন এমন নিঃশ্বাসের ধরন যেগুলোর সঙ্গে কম মানসিক চাপ ও উদ্বেগের সম্পর্ক রয়েছে। যদি তারা এটি শনাক্ত করতে পারেন, তাহলে তারা মানুষকে শেখাতে পারবেন কীভাবে নিঃশ্বাস নিলে এসব অনুভূতি হ্রাস পায়।

লেখক: জারা জাইন্ড

রেফারেন্স: *DOI: [10.1016/j.cub.2025.05.008](https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.05.008)*

স্বাস্থ্য

ঘুমের ওপর মানসিক চাপের প্রভাব!

গবেষকরা মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশে (প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস) এমন কিছু নিউরন চিহ্নিত করেছেন, যা স্ট্রেসের সময় ঘুম ও স্মৃতিতে ব্যাঘাত ঘটায়। এই আবিষ্কার স্ট্রেসজনিত ঘুমের সমস্যার চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাতে পারে।

বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের এমন একদল নিউরন শনাক্ত করেছেন, যারা হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে কীভাবে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস ঘুম এবং স্মৃতির সমস্যার জন্ম দেয়।

২০২৫ সালের ৯ জুন *The Journal of Neuroscience*-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামের একটি নির্দিষ্ট অংশে থাকা নিউরনগুলো স্ট্রেসের প্রভাবে ঘুম এবং স্মৃতির ওপর কীভাবে প্রভাব পড়ে, সেই কাজটি পরিচালনা করে। গবেষকরা বলছেন, এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে স্ট্রেসজনিত কারণে হওয়া ঘুমের সমস্যার চিকিৎসায় নতুন পথ দেখাতে পারে।

এর আগে জানা গিয়েছিল, হাইপোথ্যালামাসের ভেতরে প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস নামের একটি গঠন রয়েছে, যেখানকার নিউরনগুলো ঘুম এবং স্মৃতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মস্তিষ্কের অংশের সাথে যোগাযোগ করে। এই

নিউরনগুলো “কর্টিকোট্রপিন” নামের একটি হরমোন নিঃসরণ করে এবং স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এতদিন এই নিউরনগুলো কীভাবে স্ট্রেসের মাধ্যমে ঘুম ও স্মৃতিতে প্রভাব ফেলে, তা অস্পষ্ট ছিল।

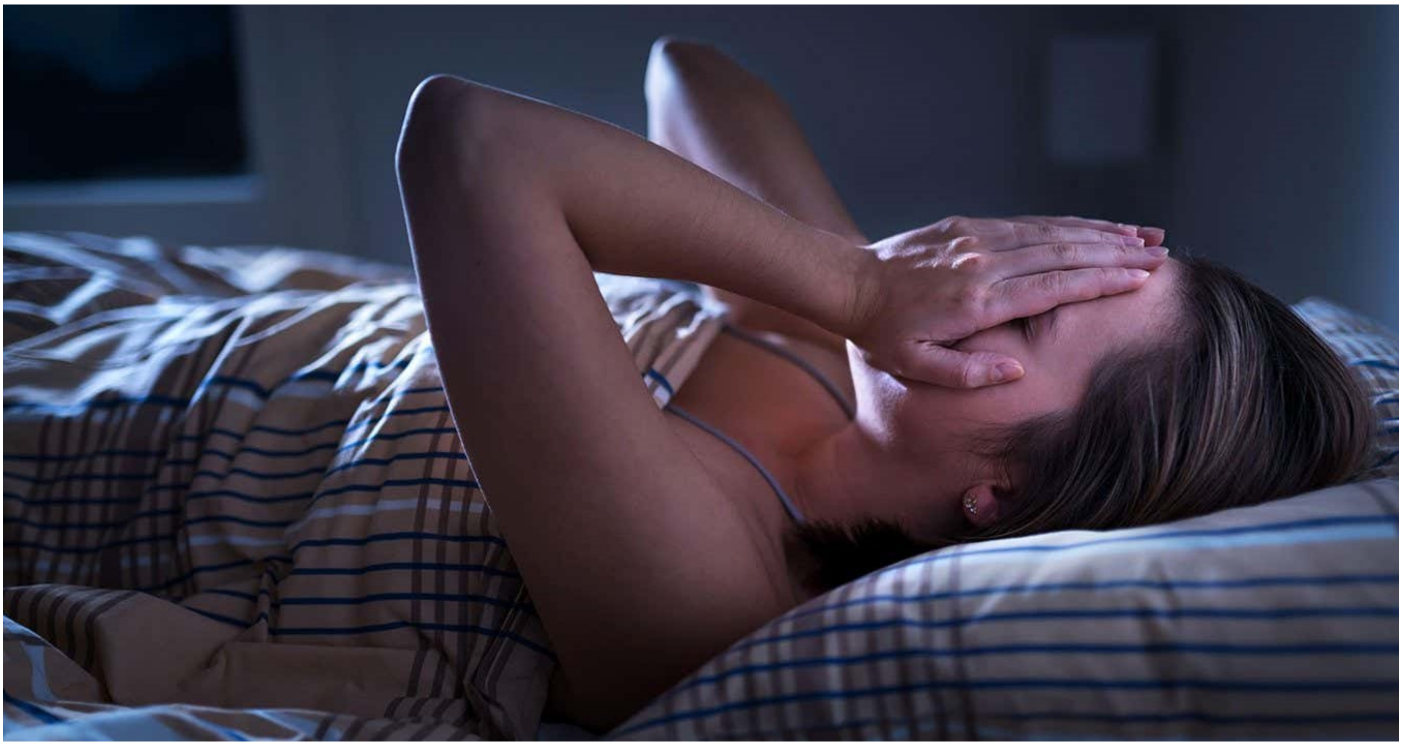

Tero Vesalainen/Alamy

গবেষকরা এই রহস্যের সমাধান খুঁজতে ল্যাবরেটরির ইঁদুরদের তাদেরকে প্লাস্টিকের টিউবে আটকে রাখার মাধ্যমে স্ট্রেসের মধ্যে ফেলে দেন। পরে তাদের ঘুম এবং স্থানভিত্তিক স্মৃতি (spatial memory) পরীক্ষা করা হয়।

প্রতীক্ষিতভাবেই দেখা যায়, স্ট্রেসপ্রাপ্ত ইঁদুরদের ঘুমের সমস্যা হয় এবং পরদিন স্মৃতিশক্তি পরীক্ষায় তারা খারাপ করে। পরবর্তীতে যখন প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াসের নিউরনগুলোকে কৃত্রিমভাবে উদ্দীপ্ত করা হয়, তখনও একই সমস্যা দেখা যায়। আবার যখন এই নিউরনগুলোকে ব্লক করে দেওয়া হয়, তখন ইঁদুরদের ঘুম কিছুটা উন্নত হয় এবং স্মৃতিশক্তি আরও ভালোভাবে কাজ করে।

গবেষকদের ধারণা, স্ট্রেসের সময়ে এই নিউরনগুলো ঘুম এবং স্মৃতির ওপর ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলে।

স্ট্রেসজনিত মানসিক রোগ যেমন পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার (PTSD) বা বড় ধরনের ডিপ্রেশন—এই রোগগুলোর প্রাথমিক লক্ষণই ঘুম ও স্মৃতির সমস্যা। গবেষকরা বলছেন, যদি এই প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াসের নিউরনগুলোকে টার্গেট করে চিকিৎসা করা যায়, তাহলে এসব রোগের অগ্রগতি ধীর করা সম্ভব হতে পারে।

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2146-24.2025*

পদার্থবিজ্ঞান

নিয়ানডার্থাল বিলুপ্তির নতুন তত্ত্ব

একটি নতুন গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে, ৪১,০০০ বছর আগে পৃথিবীর চৌম্বক মেরু স্থানান্তরের ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও মহাজাগতিক বিকিরণ বেড়ে গিয়ে নিয়ান্ডারথালদের বিলুপ্তিতে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এই তত্ত্বের পক্ষে জোরালো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, এবং নিয়ান্ডারথালরা পোশাক, ওখার ব্যবহার ও পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের দিক থেকে যথেষ্ট দক্ষ ছিল।

নিয়ানডার্থালদের বিলুপ্তি নিয়ে বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছে। এর মূল কারণ হলো তাদের অস্তিত্ব ও হঠাৎ বিলুপ্তির পেছনের প্রকৃত কারণগুলো আজও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

সাম্প্রতিক এক গবেষণা এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল, '*Science Advance*' জার্নালে প্রকাশিত তাদের এক গবেষণায় দাবি করেছে, নিয়ানডার্থালরা মহাজাগতিক কারণে বিলুপ্ত হয়েছিল।

গবেষণাটি নেতৃত্ব দেন স্পেস ফিজিক্সের বিশেষজ্ঞ অগ্নি মুখোপাধ্যায়। স্পেস ফিজিক্স হচ্ছে এমন একটি শাখা যা মহাকাশের প্রাকৃতিক প্লাজমা (পদার্থের একটি অবস্থা) নিয়ে কাজ করে, যেমন আমাদের সৌরজগতের ভেতরের প্লাজমা। উল্লেখ্য, সূর্য ও নক্ষত্রগুলোর মতো মহাবিশ্বের বেশিরভাগ বস্তুই প্লাজমা দিয়ে তৈরি।

মুখোপাধ্যায়ের মতে, আজ থেকে প্রায় ৪১,০০০ বছর আগে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর হঠাৎ স্থানান্তর (যাকে বলা হয় ল্যাশঁপ ইভেন্ট) নিয়ানডার্থালদের বিলুপ্তির পেছনে বড় কারণ হতে পারে।

এই ঘটনায় পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে মহাজাগতিক রশ্মি ও অতিবেগুনি বিকিরণ অনেক বেশি পরিমাণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে। এর ফলে একপ্রকার 'বিরূপ' পরিবেশ তৈরি হয়, যা নিয়ানডার্থালরা সহ্য করতে পারেনি। আর সেই সুযোগেই আধুনিক মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্স) টিকে থাকার সুযোগ তৈরি হয়।

হোমো স্যাপিয়েন্সের সুবিধা কোথায় ছিল?

গবেষণায় বলা হয়েছে, হোমো স্যাপিয়েন্সরা সম্ভবত গা-লেগে থাকা পোশাক পরত, রোদ থেকে রক্ষার জন্য ওখার (এক ধরনের খনিজ পদার্থ) ব্যবহার করত, এবং গুহায় আশ্রয় নিত। এসব কারণে তারা অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতি থেকে বাঁচতে পেরেছিল। অবশ্য গুহা, নিয়ান্ডারথাল এবং হোমো স্যাপিয়েন্স; দু'দলই একসঙ্গে ব্যবহার করতো।

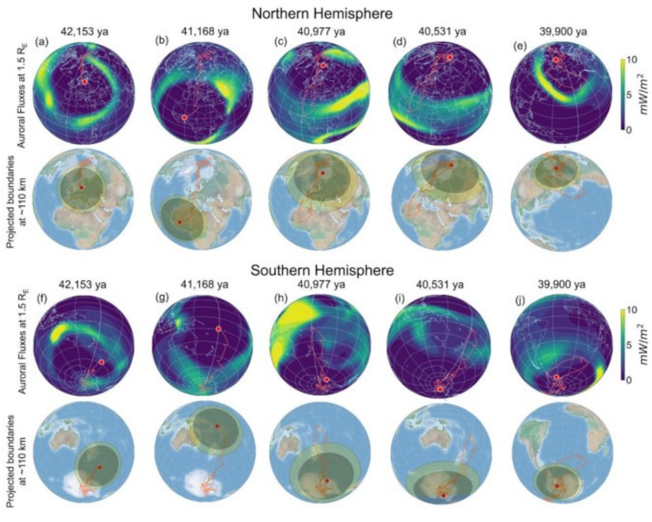

ল্যাশঁপ ইভেন্টের সময়, সবুজ ও হলুদ রঙের গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দেখানো অরোরা পৃথিবীর বহু স্থানে দৃশ্যমান ছিল (Agnit Mukhopadhyay/University of Michigan)

এই গবেষণাটি ত্রি-মাত্রিক ভূ-স্থানিক মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি। তবে একটি মাত্র ভেরিয়েবলের ওপর ভিত্তি

করে এত জটিল একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত টানা কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়।

ঘন পোশাক ও সেলাই সুচ

এই তত্ত্বের একটি মূল ভিত্তি হলো—নিয়ানডার্থালরা গা-লেগে থাকা পোশাক পরত না, তাই তারা অতিরিক্ত সূর্যরশ্মির শিকার হতো।

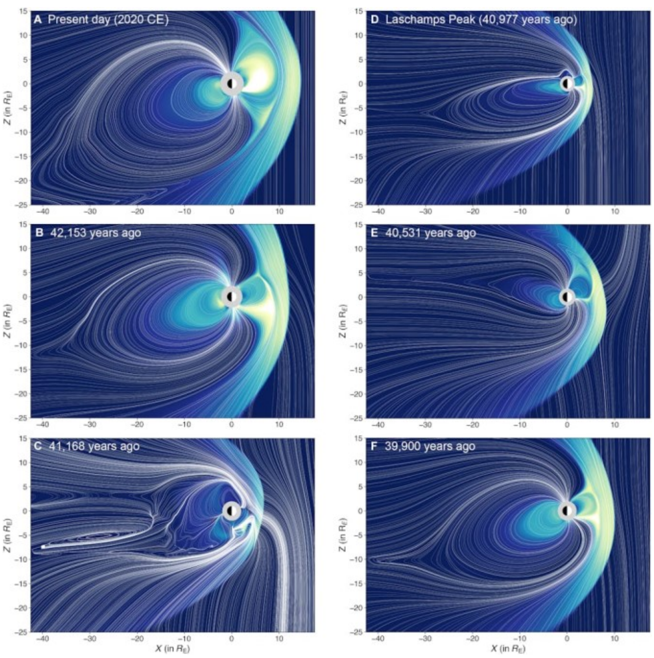

Agnit Mukhopadhyay/University of Michigan/Science Advance

এটা সত্যি যে, নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে সেলাই সুচ (sewing needle) সরাসরি যুক্ত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। ইউরেশিয়ায় প্রথম সুচের খোঁজ মিলেছে প্রায় ৫০,০০০ বছর আগের, যা ডেনিসোভান বা স্যাপিয়েন্সদের সঙ্গে জড়িত। পশ্চিম ইউরোপে এগুলো এসেছে আরও পরে, প্রায় ২৩,০০০ বছর আগে।

তবে, সুচ না থাকার মানে এই নয় যে নিয়ানডার্থালরা পোশাক পরত না। বরং, হোমো স্যাপিয়েন্সরাও অনেক ঠান্ডা সময়ে (যেমন হাইনরিখ ৪ ইভেন্ট, প্রায় ৩৯,৬০০ বছর আগে) সেলাই সুচ ছাড়াই পোশাক বানিয়েছিল।

আর্কিওলজিকাল প্রমাণ অনুযায়ী, নিয়ান্ডারথালরা চামড়া প্রক্রিয়াজাত করত; তাদের ব্যবহৃত স্ক্র্যাপার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সেটা প্রমাণ করে। তাই ধরে নেওয়া যায়, তারা চামড়া দিয়ে পোশাক, জুতা বা তাঁবুর মতো কিছু তৈরি করতে পারত। সুচ না থাকলেও চামড়া বাঁধার জন্য হাড়ের খুঁটি বা দড়ির মতো বিকল্প ব্যবহার সম্ভব ছিল।

তবে পশম বা পোশাক ব্যবহারের ইতিহাস আরও অনেক পুরোনো। আসলে, বডি লিচ জেনেটিক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষ অন্তত ২,০০,০০০ বছর আগে থেকেই পোশাক পরা শুরু করেছিল।

তার ওপর, ইউরোপের মতো ঠান্ডা অঞ্চলে, যেখানে নিয়ানডার্থালরা বাস করত, শরীর আচ্ছাদন ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভবই হতো না। তারা যদি সুচ ব্যবহার না-ও করে থাকে, তবুও খুব সম্ভবত তারা দড়ি বা হাড়ের টুকরোর মতো বিকল্প পদ্ধতিতে পশুর চামড়া শরীরের সঙ্গে মানিয়ে নিত। তাই সুচ না থাকাকে কার্যকরী পোশাকের অনুপস্থিতি ভাবা ঠিক নয়।

প্রাগৈতিহাসিক সানস্ক্রিন: ওখার ব্যবহার

গবেষণাটি বলছে, হোমো স্যাপিয়েন্সরা ওখার ব্যবহার করত সূর্যের রশ্মি থেকে রক্ষার জন্য।

যদিও কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ওখার মধ্যে UV রশ্মি ঠেকানোর ক্ষমতা থাকতে পারে, তবে এটি শুধুই স্যাপিয়েন্সদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একই সময়ে আফ্রিকা, নিকটপ্রাচ্য ও আইবেরিয়ান উপদ্বীপে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে রঙ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

স্পেনের মুরসিয়ার কুয়েভা আন্তোন গুহায় পাওয়া একটী ছিদ্রযুক্ত স্ক্যালপ ঝিনুকের খোল (João Zilhão)

নিয়ানডার্থালদের ওখার ব্যবহার প্রায় ১,০০,০০০ বছর আগের ইউরোপ ও লেভান্ত অঞ্চল থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের এই ব্যবহার ছিল বহুবিধ— ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো প্রতীকী, চিকিৎসা, প্রসাধনী, ক্ষত সারানো কিংবা পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য।

তাই শুধু স্যাপিয়েন্সদের ক্ষেত্রেই এটা সুরক্ষামূলক ব্যবহার ছিল বলে ধরা সঠিক হবে না। আর এটা যে সানস্ক্রিন হিসেবেই ব্যবহৃত হতো, সেটাও নিশ্চিত নয়।

সংখ্যায় কম ছিল নিয়ান্ডারথালরা

নিয়ান্ডারথালদের বিলুপ্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে তাদের জনসংখ্যার তুলনামূলক স্বল্পতা। তারা সংখ্যায় কম ছিল, আর স্যাপিয়েন্সরা বেশি। ফলে নিয়ান্ডারথালরা ধীরে ধীরে আধুনিক মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায়।

এই ধারণাটি জেনেটিক গবেষণায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক মানুষের ডিএনএ-তে নিয়ান্ডারথালদের অংশ রয়েছে—যা প্রমাণ করে, তারা একেবারে বিলুপ্ত না হয়ে বিবর্তনের ধারায় মিশে গেছে।

প্রযুক্তিগত দিক থেকেও স্যাপিয়েন্সরা এগিয়ে ছিল। নিয়ান্ডারথালদের দূর থেকে আক্রমণের অস্ত্র ছিল না, যেখানে স্যাপিয়েন্সরা প্রজেক্টাইল (নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র) ব্যবহার করত, যা তাদের শিকার ও অভিযোজনের ক্ষেত্রে সুবিধা দেয়।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব

মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্ব অনুযায়ী, সূর্যের অতিরিক্ত রশ্মি ও পৃথিবীর চৌম্বকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ান্ডারথাল বিলুপ্তির সরাসরি সম্পর্ক টানা হলেও এর পক্ষে শক্ত কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই।

ল্যাশঁপ ইভেন্ট চলাকালীন হঠাৎ জনসংখ্যা ধসে পড়েছে—এমন কোনো নিদর্শন নেই। এই সময়ে অন্য মানব ও প্রাণী প্রজাতির মধ্যেও কোনো ভয়াবহ বিপর্যয়ের প্রমাণ মেলেনি।

তদুপরি, যদি অতিবেগুনি রশ্মিই প্রধান কারণ হতো, তবে আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের স্যাপিয়েন্সদের মাঝেও বড় আকারের মৃত্যু হতো, যাদের অনেকেই গা-লেগে থাকা পোশাক পরত না কিংবা গুহায় থাকত না। কিন্তু তেমন কিছু ঘটেছে বলে জানা যায় না।

নিয়ান্ডারথালদের হঠাৎ 'বিলুপ্তি' বুঝতে হলে, আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞান ও জেনেটিক নানা দিক একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

তারা কেবল প্রযুক্তির দীনতা বা পরিবেশের শিকার ছিল না। বরং, তারা ছিল অভিযোজিত ও সাংস্কৃতিকভাবে জটিল এক মানব প্রজাতি, যারা ৩ লাখ বছরেরও বেশি সময় ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে ছিল—যেমন ১,২০,০০০ বছর আগে ঘটে যাওয়া ব্লেক ইভেন্টের সময়।

তারা জটিল সরঞ্জাম বানাতে পারত, বিশাল অঞ্চল দখলে রেখেছিল, এবং বহু দিক থেকে আমাদের আধুনিক প্রজাতির সঙ্গে তাদের মিল ছিল, যা আগে ভাবা হতো না।

তাই, পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর উল্টেপড়া কি নিয়ান্ডারথালদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল? উত্তর সম্ভবত—না।

লেখক: জান্নাতুল মাইশা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1126/sciadv.adq7275*

স্বাস্থ্য

নতুন রক্তের গ্রুপের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা

ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা "গোয়াডা নেগেটিভ" নামে এক নতুন রক্তের গ্রুপ শনাক্ত করেছেন। এটি এখন পর্যন্ত পাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বিরল রক্তের গ্রুপ, যা একমাত্র গুয়াডেলুপের এক নারীর শরীরে পাওয়া গেছে। এটি বিশ্বের ৪৮তম স্বীকৃত রক্ত গ্রুপ সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

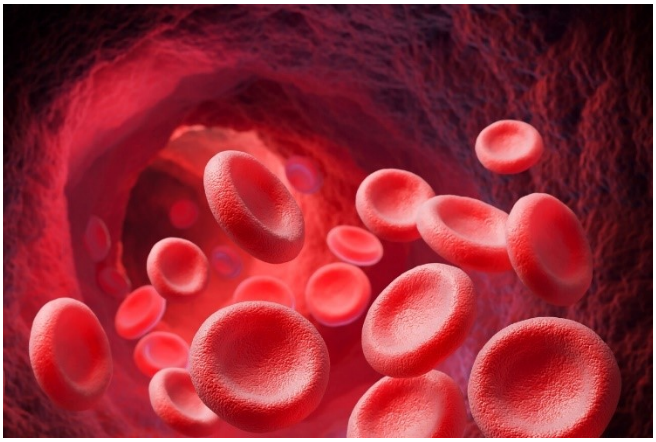

anusorn nakdee/Getty Images

ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা এক যুগান্তকারী আবিষ্কারে একটি সম্পূর্ণ নতুন রক্তের গ্রুপ শনাক্ত করেছেন, যা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের ৪৮তম রক্ত গ্রুপ সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। "গোয়াডা নেগেটিভ (Gwada Negative)" নামে পরিচিত এই বিরল রক্তের গ্রুপটি পাওয়া গেছে ক্যারিবীয় অঞ্চলের ফরাসি দ্বীপ গুয়াডেলুপের এক নারীর শরীরে এবং ধারণা করা হচ্ছে, এটি শুধুমাত্র তার মধ্যেই বিদ্যমান।

চলতি মাসের শুরুতে ইতালির মিলানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রক্ত সঞ্চালন সংস্থা (ISBT) এই নতুন রক্তের গ্রুপটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। ফ্রান্সের জাতীয় রক্ত সংস্থা, French Blood Establishment (EFS), সামাজিক মাধ্যমে এই আবিষ্কারের কথা জানিয়ে নতুন রক্ত গ্রুপ সিস্টেম যুক্ত হওয়ার বিষয়টি উদযাপন করে।

এই আবিষ্কারের যাত্রা শুরু হয় ২০১১ সালে, যখন প্যারিসে বসবাসকারী ৫৪ বছর বয়সী ওই নারী এক রুটিন অস্ত্রোপচারের আগে রক্ত পরীক্ষা করান। পরীক্ষায় তার রক্তে অজানা এক অ্যান্টিবডি শনাক্ত করেন চিকিৎসা জীববিজ্ঞানীরা। তবে তখন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা যায়নি।

এরপর ২০১৯ সালে গবেষকরা উন্নত ডিএনএ সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি জিনগত পরিবর্তন (mutation) শনাক্ত করেন, যা এই নতুন রক্তের গ্রুপের মূল কারণ। EFS-এর তথ্য অনুযায়ী, নারীর উভয় পিতামাতাই ওই পরিবর্তিত জিন বহন করতেন, এবং তা থেকে তিনি এই বিরল রক্তের ধরনটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন—ফলে পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার এই রক্ত রয়েছে এবং কেবল নিজের রক্তই তার জন্য উপযুক্ত।

"গোয়াডা নেগেটিভ" নামটি রাখা হয়েছে ওই নারীর গুয়াডেলুপ দ্বীপের শিকড়কে সম্মান জানিয়ে। এই নামটি এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে এটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী যে, এই আবিষ্কারের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও বিরল রক্তের গ্রুপ শনাক্ত করা সম্ভব হবে, যা দুর্লভ রক্তের প্রয়োজনে থাকা রোগীদের জন্য চিকিৎসা উন্নত করতে সহায়ক হবে।

এই আবিষ্কার রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যেখানে গবেষকরা বলছেন, ডিএনএ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নতুন রক্ত গ্রুপ শনাক্ত করার গতি অনেক বেড়ে গেছে।

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

অতিপরিবাহী

সুপারকন্ডাক্টর বা অতিপরিবাহী হলো এমন এক পদার্থ যা বিদ্যুৎকে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই প্রবাহিত হতে দেয়।

অনেক পদার্থই বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে—অর্থাৎ, তাদের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট (তড়িৎ প্রবাহ) প্রবাহিত হতে পারে। এই ধরনের পদার্থকে পরিবাহী (conductors) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধাতব তারের মাধ্যমে আমাদের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস এবং গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে।

কিন্তু প্রায় সব পরিবাহীতেই কিছুটা প্রতিবন্ধকতা (resistance) থাকে। কেন? কারণ, যখন ইলেকট্রন কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তারা অন্যান্য কণার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের কারণে কিছু শক্তি নষ্ট হয়, যা আমরা তাপ হিসেবে অনুভব করি। এজন্যই আমাদের কম্পিউটারে কুলিং ফ্যান লাগে।

কিন্তু সুপারকন্ডাক্টর বিদ্যুৎ পরিবাহিত করে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই। তবে এই বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র অতিমাত্রায় ঠান্ডা তাপমাত্রায় দেখা যায়। কারণ, যেকোনো তাপ শক্তি ইলেকট্রনকে নাড়িয়ে দেয়, যার ফলে সংঘর্ষ ঘটে। তাপ যত কম, নাড়াচাড়া তত কম; ফলে সংঘর্ষও কম হয়, এবং প্রতিবন্ধকতাও কমে যায়।

খুব ঠান্ডা অবস্থায় পারদ (mercury) এবং সীসা (lead) সুপারকন্ডাক্টর হয়ে যায়। কিছু যৌগও (compound) সুপারকন্ডাক্টর হতে পারে। যেমন, টাইটানিয়াম এবং নাইওবিয়াম দিয়ে তৈরি সংকর ধাতু।

অনেক আধুনিক প্রযুক্তি সুপারকন্ডাক্টরের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কোয়ান্টাম কম্পিউটার। এসব কম্পিউটার তথ্য সংরক্ষণের জন্য কিউবিট (qubit) নামক একক ব্যবহার করে, যার জন্য সুপারকন্ডাক্টর প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা সুপারকন্ডাক্টর ব্যবহার করে শক্তিশালী ইলেক্ট্রোম্যাগনেট বা বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরি করতে পারেন। এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেট এমন এক ধরনের চুম্বক যা কেবলমাত্র যখন তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখনই চুম্বকীয় হয়। সুপারকন্ডাক্টর প্রতিবন্ধকতা ছাড়া বিদ্যুৎ পরিবাহিতা করতে পারায়, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম।

সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেট MRI (Magnetic Resonance Imaging) মেশিনে ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রগুলো মানুষের শরীরের ভিতরের বিস্তারিত ছবি তুলে, যা ডাক্তারদের মস্তিষ্কে আঘাত বা টিউমার শনাক্ত করার মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করে।

সুপারকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি চুম্বকই পৃথিবীর দ্রুততম ট্রেনগুলো চালায়। এমন এক ধরনের ট্রেন হলো ম্যাগলেভ (Maglev), যার পূর্ণরূপ Magnetic Levitation। এই ট্রেন সাধারণ ট্রেনের মতো রেলের ওপর চলে না, তারা রেলের ওপরে ভেসে চলে। রেল এবং ট্রেনের চুম্বক একে অপরকে বিকর্ষণ করে। ফলে ট্রেনটা ভেসে থাকে, কোনো ঘর্ষণ হয় না, ফলে গতি কমে না।

প্রথম বাণিজ্যিক ম্যাগলেভ ট্রেন চালু হয় চীনের সাংহাই শহরে, ১ জানুয়ারি ২০০৪ সালে। এর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪৩১ কিলোমিটার। জাপানের এল জিরো সিরিজ (L0 Series) ম্যাগলেভ ট্রেন এর চেয়ে আরও দ্রুত চলে—ঘণ্টায় ৬০৩ কিলোমিটার। এমন গতি থাকলে একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া মাত্র দেড় ঘণ্টায় পৌঁছাতে পারবেন।

তবে বর্তমান সময়ের সুপারকন্ডাক্টরগুলো কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাগলেভ ট্রেনের চুম্বকগুলোকে –২৬৮° সেলসিয়াস (–৪৫০° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় ঠান্ডা রাখতে হয়।

মজার ব্যাপার হলো, আমরা এখনও অতিপরিবাহীতার পেছনের কারণ পুরোপুরি জানিনা। লেজার-ভিত্তিক ইমেজিং প্রযুক্তির মাধ্যমে ইলেকট্রনের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে হয়তো একদিন আমরা জানাতে পারবো কীভাবে সুপারকন্ডাক্টর বিদ্যুৎকে প্রতিবন্ধকতা ছাড়া পরিবাহণ করতে পারে।

লেখক: সুমাইয়া আক্তার রিয়া

প্রযুক্তি

পারকিনসন রোগ শনাক্তে নতুন দিগন্ত

গবেষকরা একটি নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক পদ্ধতি তৈরি করেছেন যা মানুষের কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ করে পারকিনসন রোগ শনাক্ত করতে পারে। সেল্ফ-সুপারভাইজড স্পীচ এম্বেডিং ও ফিউশন মডেল ব্যবহার করে এই প্রযুক্তি প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ে সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে চিকিৎসক-স্বল্প দেশগুলোতে।

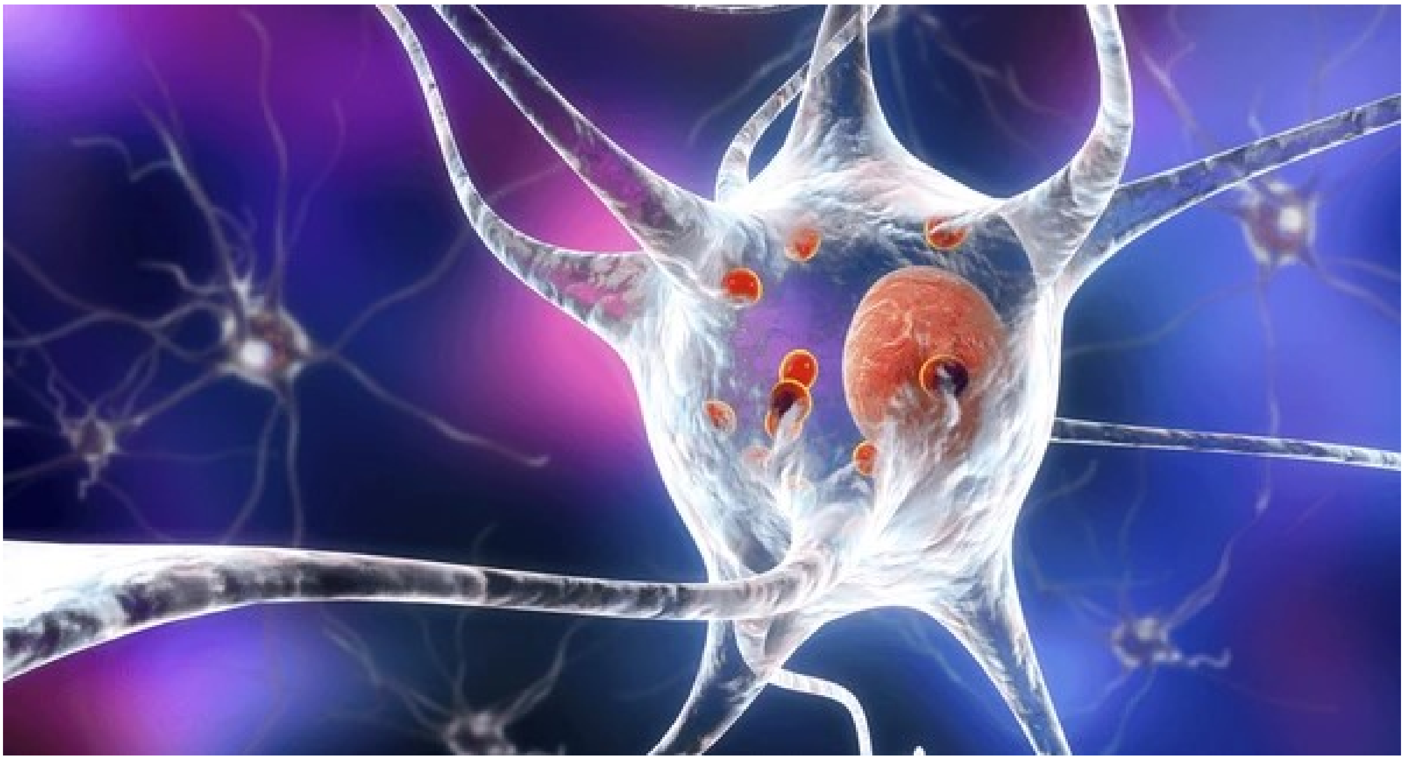

Kateryna Kon/Shutterstock

মানুষের কণ্ঠস্বর শুধু আবেগ প্রকাশেই নয়, লুকিয়ে থাকতে পারে শারীরিক রোগের আভাসও। সম্প্রতি একদল গবেষক এক অভিনব পদ্ধতি তৈরি করেছেন, যা কণ্ঠ বিশ্লেষণ করে পারকিনসন রোগ শনাক্ত করতে সক্ষম। এই গবেষণা মূলত 'সেল্ফ-সুপারভাইজড স্পীচ এম্বেডিং (Self-supervised Speech Embedding)' ব্যবহার করে কণ্ঠের অদৃশ্য সংকেত বিশ্লেষণ করে থাকে। এতে ব্যবহৃত হয়েছে Wav2Vec 2.0, WavLM এবং ImageBind নামক আধুনিক প্রযুক্তি, যা মূলত কথা বলার ধরন, স্বরের কম্পন, স্থিরতা ও শব্দের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারে।

গবেষণায় ১,৩০৬ জন অংশগ্রহণকারী (যার মধ্যে ৩৯২ জন পারকিনসন রোগে আক্রান্ত এবং ৯১৪ জন সুস্থ) একটি নির্দিষ্ট বাক্য পাঠ করেছিলেন—"The quick brown fox jumps over the lazy dog।" এ বাক্যটি ইংরেজি ভাষার সব বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা কণ্ঠ বিশ্লেষণে সহায়ক হয়। এরপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ফিউশন মডেল এই ভয়েস ক্লিপ বিশ্লেষণ করে কে পারকিনসনে আক্রান্ত, তা নির্ণয় করে।

ফলাফল ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক—৮৮.৯% AUROC (Area Under ROC Curve) এবং ৮৫.৭% নির্ভুলতা পাওয়া গেছে। এই স্কোর আগের যেকোনো ভয়েস-ভিত্তিক পারকিনসন শনাক্তকরণ পদ্ধতির তুলনায় উন্নত। গবেষকরা বলেছেন, এই মডেল বয়স, লিঙ্গ ও জাতিগত বৈচিত্র্যকেও

বিবেচনায় নিয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভুলভাবে কাজ করেছে।

আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো, এই মডেল শুধু রেকর্ড করা ভয়েসই নয়, বাস্তব সময়ের কথোপকথন থেকেও রোগ শনাক্ত করতে পারে। দুইটি স্বতন্ত্র ক্লিনিক্যাল ডেটাসেট এবং একটি স্পন্টেনিয়াস ভয়েস ডেটাসেটে পরীক্ষার সময় যথাক্রমে ৮২.১%, ৭৮.৪% এবং ৭৭.৪% AUROC স্কোর পাওয়া গেছে।

"নতুন মডেলটি যেকোনো ভয়েস-ভিত্তিক পারকিনসন রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতির তুলনায় উন্নত"

এই উদ্ভাবনের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে প্রাথমিক রোগ শনাক্তকরণ ব্যবস্থায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে একজন নিউরোলজিস্টের পেছনে লাখ লাখ মানুষ নির্ভরশীল, সেখানে এমন সহজলভ্য, স্বয়ংক্রিয় ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা বিপ্লব ঘটাতে পারে। শুধু একটি মাইক্রোফোন বা মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করেই ঘরে বসে সম্ভাব্য রোগ শনাক্ত করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত বাংলাদেশি গবেষক একরাম হোসেন বলেন, "আমরা একটি এন্ড-টু-এন্ড মেশিন লার্নিং পাইপলাইন তৈরি করেছি, যা আমাকে প্রকৃত রোগীর ডেটার ওপর সম্পূর্ণভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়, একদম র (raw) কথোপকথনের সিগন্যাল প্রিপ্রসেসিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের এমবেডিং একত্রিত করার জন্য ফিউশন আর্কিটেকচার তৈরি পর্যন্ত। এই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে — সীমিত ডেটার সঙ্গে মডেলের জটিলতার ভারসাম্য বজায় রাখা, আমাদের পূর্বাভাসে ডেমোগ্রাফিক পক্ষপাত কমানো, এবং আমাদের পদ্ধতি কোথায় সফল বা ব্যর্থ হচ্ছে তা বোঝার জন্য নিবিড়ভাবে কোর্টভিত্তিক ত্রুটিবিশ্লেষণ করা।"

তবে গবেষকরা সতর্ক করেছেন, এই মডেল এখনও চিকিৎসকের বিকল্প নয়—বরং চিকিৎসকের সহায়ক একটি স্ক্রিনিং টুল হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী। ভবিষ্যতে স্থানীয় ভাষার ওপর ভিত্তি করে এর প্রশিক্ষণ বাড়ানো হলে আরও নিখুঁত ও সার্বজনীন মডেল তৈরি সম্ভব।

এই গবেষণা শুধু পারকিনসন নয়, আরও অনেক স্নায়বিক ও ভাষা-ভিত্তিক রোগ নির্ণয়ে কণ্ঠের সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে—যা আগামী দিনের ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবায় এক যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা করতে পারে।

লেখক: অরুণিমা তানহা

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41531-025-00956-7

মহাকাশ

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে তোলা প্রথম ছবি

চিলিতে অবস্থিত রুবিন অবজারভেটরি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে আকাশের প্রথম ছবি তুলেছে। ২০২৫ সালের শেষ থেকে এটি ১০ বছর ধরে প্রতি রাতেই আকাশ স্ক্যান করে মহাবিশ্বের পরিবর্তনের এক বিশাল টাইম-ল্যাপ্স রেকর্ড তৈরি করবে। এতে অজস্র গ্রহাণু, সুপারনোভা, ছায়াপথ এবং অদেখা মহাজাগতিক ঘটনার সন্ধান মিলবে। এটি সৌরজগত আবিষ্কার ও গ্রহরক্ষায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

চিলির আন্দিজ পর্বতমালার সেরো পাচন পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ভেরা সি. রুবিন অবজারভেটরি সম্প্রতি তাদের ৩২০০ মেগাপিক্সেলের ডিজিটাল ক্যামেরার (বিশ্বের সবচেয়ে বড়) প্রথম ছবি প্রকাশ করেছে, যা দেখে

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অভিভূত। গত মাসে (এপ্রিল ২০২৫) টেলিস্কোপটির নির্মাণকাজ শেষে এই ক্যামেরা দিয়ে একটি পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের সময় এই ছবি তোলা হয়।

এই পর্যবেক্ষণাগারটির নামকরণ করা হয়েছে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেরা সি. রুবিন-এর নামে, যিনি মহাবিশ্বে বিপুল পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার থাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দিয়েছিলেন।

একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ট্রিফিড নেবুলা ও লাগুন নেবুলা, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির এমন একটি অংশে যা আয়নিত হাইড্রোজেন ও নবগঠিত বা গঠনের প্রক্রিয়াধীন নক্ষত্রে পরিপূর্ণ। এই ছবিটি তৈরি হয়েছে ৬৭৮টি আলাদা এক্সপোজার থেকে, যা তোলা হয়েছে পর্যবেক্ষণাগারের সিমোনি সার্ভে টেলিস্কোপ দিয়ে মাত্র সাড়ে সাত ঘণ্টায়। প্রতিটি ছবি চারটি আলাদা রঙের ফিল্টার দিয়ে তোলা হয়, যার ফলে চূড়ান্ত ছবিটি এত প্রাণবন্ত রঙে ফুটে উঠেছে।

এই কম্পোজিট ছবিটি ৬৭৮টি আলাদা ছবি থেকে তৈরি, যা ভেরা সি. রুবিন অবজারভেটরি মাত্র সাড়ে সাত ঘণ্টার পর্যবেক্ষণ সময়ে তুলেছে। এতে উপরের ডান পাশে ট্রিফিড নেবুলা এবং লাগুন নেবুলা দেখা যাচ্ছে (RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA)

৮১০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই পর্যবেক্ষণাগারের দৃষ্টিসীমা অত্যন্ত বিস্তৃত। এটি প্রতি ৩-৪ রাতেই পুরো দক্ষিণ আকাশ স্ক্যান করতে সক্ষম। যেখানে হাবল এবং জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ নির্দিষ্ট আকাশের ক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষণ করে (যদিও তারা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে)।

অবজারভেটরি নির্মাণের ডেপুটি ডিরেক্টর সানড্রিন টমাস জানিয়েছেন, প্রথম প্রকাশিত এই ছবিগুলো মূলত অ্যাস্থেটিক ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে ও পর্যবেক্ষণাগারের ক্যামেরার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য তৈরি। এটি আসল গবেষণা-উপযোগী 'ডেটা প্রোডাক্ট' নয় । তবে এই ছবিগুলোই স্মরণ করিয়ে দেয় কেন মানুষ জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়।

এই টেলিস্কোপের ধারণাটি ১৯৯০-এর দশকে দিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, ডেভিস-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানী টনি টাইসন। তিনি বলেন, "টেলিস্কোপটি যেমন কাজ করার কথা ছিল, ঠিক তেমনই করেছে। কিন্তু চোখে দেখা একেবারেই ভিন্ন অনুভূতি — আমি মুগ্ধ এবং গর্বিত, শত শত প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীর অবদানে এই অসাধারণ সাফল্য এসেছে।"

২০২৫ সালের শেষের দিকে, রুবিন অবজারভেটরি তার মূল মিশন শুরু করবে যার নাম লিগেসি সার্ভে অব স্পেস অ্যান্ড

টাইম (LSST)। এই মিশনে পরবর্তী ১০ বছর ধরে প্রতি রাতেই আকাশ স্ক্যান করা হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে, যেন মহাবিশ্বের দৃশ্যমান প্রতিটি পরিবর্তন নিখুঁতভাবে ধরা যায়। এর ফলে তৈরি হবে এক অতি-বিস্তৃত ও আল্ট্রা-হাই-ডেফিনিশন টাইম-ল্যাপ্স আকারে মহাবিশ্বের এক আশ্চর্য দলিল। এ যেন হবে জীবন্ত এক মহাজাগতিক চিত্রপট।

বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল ক্যামেরা (Jacqueline Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory)

এই ছবিগুলো আমাদের দেখাবে গ্রহাণু, ধূমকেতু, পালসার, সুপারনোভার বিস্ফোরণ, দূরবর্তী ছায়াপথ — এমনকি এমন মহাজাগতিক ঘটনা যেগুলোর অস্তিত্ব হয়তো কেউ আগে কখনও দেখেইনি। রুবিন অবজারভেটরি হবে এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ এবং কার্যকর সৌরজগত আবিষ্কার যন্ত্র।

এটি গ্রহরক্ষা (planetary defense)-এর ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে, কারণ এটি অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক গ্রহাণু শনাক্ত করতে পারবে।

ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং স্কটল্যান্ডের রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনোমার ক্যাথেরিন হেমন্স বলেন, “আমরা যেন দীর্ঘদিন ধরে এই মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম — আমাদের ১০ বছরের মিশন অবশেষে শুরু হতে চলেছে।”

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

পদার্থবিজ্ঞান

নতুন তত্ত্ব বলছে সময় তিন মাত্রার

আলাস্কা ফেয়ারব্যাংকস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী গুনথার ক্লেটেটস্কা এক নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন, যেখানে সময়ের তিনটি মাত্রা রয়েছে, একটি নয়। তার মতে, এই বহুমাত্রিক সময় কাঠামো বাস্তবতার ভিত্তি এবং এটি মহাবিশ্বের জটিলতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এই তত্ত্ব কণার ভরের উৎপত্তি ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতো বহু পুরনো ধাঁধার সমাধান দিতে পারে। যদিও এখনও প্রমাণিত নয়, এটি “থিওরি অব এভ্রিথিং” খোঁজার পথে একটি সাহসী পদক্ষেপ।

ড. ক্লেটেটস্কা, একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এক বৈপ্লবিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, সময় হতে পারে তিনটি স্বাধীন মাত্রায় বিভক্ত, ঠিক যেমনভাবে আমরা স্থানকে X, Y ও Z অক্ষে কল্পনা করি। তার মতে, সময়ই আসল ভিত্তি বা ক্যানভাস, আর স্থান হলো তাতে আঁকা রঙের মতো।

একটি নতুন গাণিতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ড. ক্লেটেটস্কা দাবি করেছেন, প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানে যেখানে একমাত্র সময় ও তিনটি স্থানীয় মাত্রা মিলিয়ে চার-মাত্রিক স্পেসটাইম তৈরি হয়, সেখানে আরও দুটি অতিরিক্ত সময়মাত্রা যোগ করা সম্ভব। এর ফলে, এক মুহূর্তেই একাধিক সম্ভাব্য ফলাফল একসঙ্গে বিদ্যমান থাকতে পারে — এবং এগুলোর মাঝে চলাচল করা যাবে সময়ের স্বাভাবিক ধারায় সামনে বা পেছনে না গিয়ে। এই তত্ত্বে, দ্বিতীয় সময়মাত্রা

একটি ঘটনার বিকল্প শাখাগুলো দেখায়, আর তৃতীয় মাত্রা সেগুলোর মধ্যে স্থানান্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এরকম দাবি এই প্রথম নয়। তবে এই কাজটিকে ব্যতিক্রমী করে তোলে এর পরীক্ষণযোগ্যতার দাবি। পূর্ববর্তী তিন-মাত্রিক সময়তত্ত্বগুলো বেশিরভাগই কেবল গাণিতিক ধারণা ছিল, তবে ড. ক্লেটেটস্কার মতে, তার তত্ত্ব একটি বাস্তব পরীক্ষার আওতায় আনার পথ তৈরি করেছে। সময়ের জ্যামিতি যতই জটিল হোক না কেন, তার কাঠামো কারণ-ফলাফলের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে — ফলে আগের তত্ত্বগুলোর মত বিভ্রান্তিকর বিপরীতধর্মী ফলাফল এড়ানো যায়।

যদি এই তত্ত্ব সত্যি প্রমাণিত হয়, তবে এটি পদার্থবিজ্ঞানের বহু পুরনো ধাঁধাগুলোর সমাধান দিতে পারে — যেমন কণার ভর কোথা থেকে আসে, বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও মহাকর্ষকে একত্রীকরণ। তার গাণিতিক মডেল ইলেকট্রন, মিউওন এবং কোয়ার্কের মতো কণার ভর নির্ভুলভাবে রিপ্রোডিউস করতে সক্ষম, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই সময় কাঠামো একাধিক সমস্যার একটি অভিন্ন সমাধান দিতে পারে।

তবে, এই অতিরিক্ত সময়মাত্রাগুলো বাস্তবে কীভাবে প্রকাশ পায় — তা আরও গবেষণার প্রয়োজন। ধারণা করা হচ্ছে, এরা কেবলমাত্র মহাবিশ্বের আদিকালে বা উচ্চ-শক্তির কণাকণার সংঘর্ষে ধরা দিতে পারে। তবুও, সময়কে একটি সরল অগ্রগামী রেখা হিসেবে না দেখে একটি জটিল বহুমাত্রিক কাঠামো হিসেবে কল্পনা করার এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিয়ে যেতে পারে সেই বহু কাঙ্ক্ষিত "সবকিছুর তত্ত্ব"-এর দিকে — যা প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকে একীভূত করার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সম্পাদকের কথা: *যদিও ক্লেটেটস্কার তিন-মাত্রিক সময় তত্ত্ব একটি মজার ও নতুন ধারণার ভিত্তি গড়ে দেয়, তবে এটি এখনো বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃতি পায়নি। এই তত্ত্ব এখনো পর্যালোচনার প্রাথমিক ধাপে রয়েছে এবং শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হয়নি বা কোনো স্বাধীন পরীক্ষা কিংবা অন্য কোন পিয়ার দ্বারা পুনরায় যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে যায়নি। যে জার্নালে এটি প্রকাশিত হয়েছে—Reports in Advances of Physical Sciences (World Scientific Publishing)—তা বৈধ হলেও, এত বড় দাবির জন্য যথেষ্ট নয়। এই জার্নালটি তুলনামূলকভাবে নিম্ন-প্রভাবসম্পন্ন ও নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর জন্য। এর মান Physical Review Letters বা Nature Physics-এর মতো উচ্চমানের জার্নালের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল। একটি বৈপ্লবিক ধারণা স্বীকৃতি পেতে হলে তা অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞানী সমাজের কঠোর সমালোচনামূলক মূল্যায়নের মুখোমুখি হতে হবে, মর্যাদাসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে, এবং পরীক্ষণযোগ্য পূর্বাভাস দিতে হবে যেগুলো বিদ্যমান তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—এবং এখন পর্যন্ত, এই তত্ত্ব সেই মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি।*

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

রেফারেন্স: *DOI: 10.1142/S2424942425500045*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণ করা প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মাধ্যমে মাত্র ৬.৪ মিলিয়ন বছর বয়সী TWA 7 নামের এক নবগঠিত নক্ষত্র ডিস্কে একটি শীতল, হালকা ও সম্ভাব্য গ্রহের সন্ধান মিলেছে। গ্রহটি ডিস্কের একটি রিং-এর ফাঁকা স্থানের জন্য দায়ী হতে পারে, যা গ্রহ-ডিস্ক পারস্পরিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

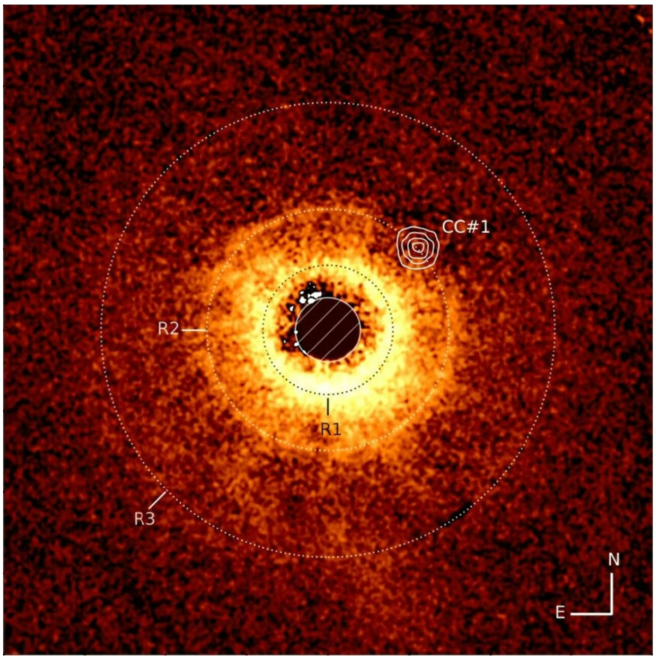

JWST/ESO/Lagrange

মহাকাশ গবেষণার জগতে এক বিশাল অগ্রগতি এনে দিয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST)। সম্প্রতি এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে গবেষকরা সৌরজগতের বাইরে এমন এক গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যা আমাদের বৃহস্পতি গ্রহের তুলনায় অনেক হালকা — মাত্র ০.৩ গুণ বৃহস্পতি ভরের — এবং TWA 7 নামের এক অতি কিশোর নক্ষত্রের চারপাশে অবস্থান করছে। গ্রহটির নাম দেয়া হয়েছে TWA-7b।

TWA 7 মাত্র ১১১ আলোকবর্ষ দূরে ৬.৪ মিলিয়ন বছর বয়সী একটি নিকটবর্তী নক্ষত্র, যার চারপাশে ধূলিকথা ও ধ্বংসাবশেষে গঠিত এক সুসজ্জিত ডিস্ক রয়েছে। ডিস্কে তিনটি সুস্পষ্ট বৃত্তাকার অঞ্চল বা রিং দেখা যায়, যার মধ্যে একটি R2 রিং। এই রিং এর ভেতরে একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে। এই শূন্যস্থানটিতেই শনাক্ত হয়েছে একটি সম্ভাব্য গ্রহ, যার উপস্থিতি থেকেই এই ফাঁকা স্থানটি তৈরি হয়েছে বলে ধারণা বিজ্ঞানীদের।

প্রথমবারের মতো JWST-এর MIRI ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে থার্মাল ইনফ্রারেডে সরাসরি এই গ্রহের আলোর ইঙ্গিত দেয়। আগে আটাকামা লার্জ মিলিমিটার অ্যারে (ALMA) এর পর্যবেক্ষণে TWA 7 নক্ষত্রের চারপাশের ডিস্কে রিং বা বৃত্তাকার গঠনের প্রমাণ মিলেছিল। কিন্তু এটি এতটাই দুর্বল ও ঠান্ডা ছিল, যে এখন পর্যন্ত কোনো টেলিস্কোপই এমন গ্রহ চিহ্নিত করতে পারেনি। গ্রহটির আনুমানিক তাপমাত্রা ৩০৫ থেকে ৩৩৫ কেলভিনের মধ্যে (প্রায় ৩০-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)।

তবে এটি সত্যিই একটি গ্রহ কিনা, না কোনো দূরবর্তী গ্যালাক্সির ভ্রান্ত আলো, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে গবেষকরা বিশ্লেষণ চালান। বিশ্লেষণে দেখা যায়, আলোটি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড গ্যালাক্সি হলে তার সম্ভাবনা মাত্র ০.৩৪% — যা একে গ্রহ হওয়ার পক্ষেই জোরালোভাবে সমর্থন করে।

আরও চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, ন-বডি (N-body) সিমুলেশনের মাধ্যমে যখন এই সম্ভাব্য গ্রহকে ৫২ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরত্বে বসানো হয়, তখন সেই মডেল থেকে যে রিং ও ফাঁকা স্থান তৈরি হয়, তা বাস্তবের ছবির সঙ্গে অসাধারণভাবে মিলে যায়। অর্থাৎ এই গ্রহই সম্ভবত TWA 7-এর ডিস্কে 'গ্যাপ' বা শূন্যস্থান গঠনের প্রধান কারিগর।

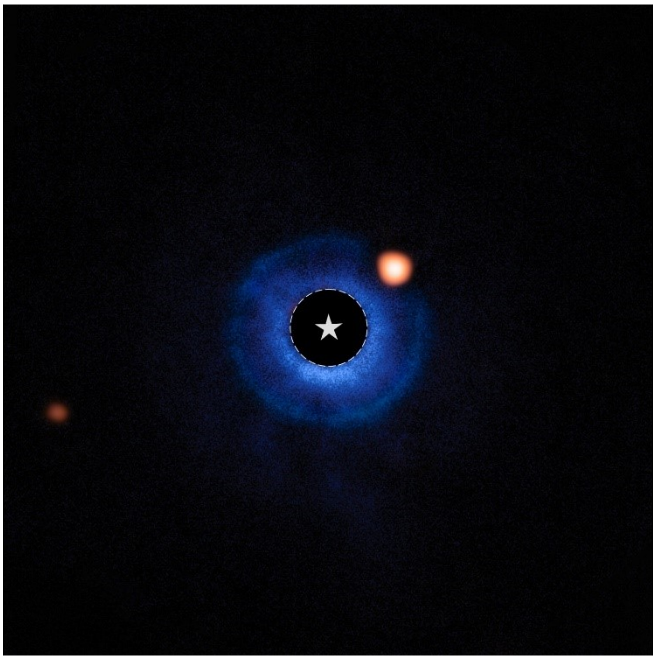

ESA/NASA, CSA/Anne-Marie Lagrange (CNRS, UGA)/Mahdi Zamani (ESA/Webb)

এই আবিষ্কার একদিকে যেমন মহাবিশ্বে গ্রহ গঠনের রহস্য উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সরাসরি এমন হালকা গ্রহের চিত্রায়নের মাধ্যমে JWST নতুন এক যুগের সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে এই গ্রহের স্পেকট্রোস্কপিক বিশ্লেষণ করলে এর বায়ুমণ্ডল ও গঠন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা সম্ভব হবে, যা আমাদের সৌরজগতের বিশাল গ্রহগুলোর তুলনায় নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি দেবে।

লেখক: সাফিয়া তাবাসসুম রুমু

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09150-4*

জুন মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

সূত্র: নেচার

বড় চোখ কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি

এই কমলার আকারের চোখটি এক সময় একটি হামব্যাক তিমি (*Megaptera novaeangliae*)-র ছিল। বর্তমানে এটি বিজ্ঞানীদের কাছে এই বিশাল চোখ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নতুন তথ্য দিচ্ছে। গবেষকরা চোখের গঠন বিশ্লেষণ করে এবং কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করে পানির নিচে তিমির দৃষ্টি কেমন হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। গবেষণায় জানা গেছে, তিমির চোখ বড় হলেও তারা আসলে খুব কাছের জিনিসই স্পষ্ট দেখতে পারে, মানে তারা প্রচণ্ডভাবে ক্ষীণদৃষ্টি।

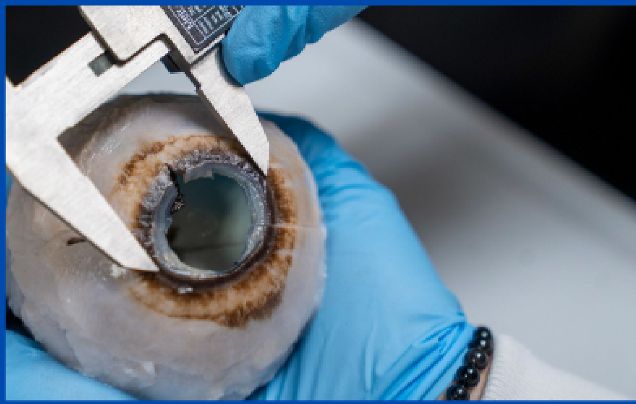

Michael Spencer/UNCW

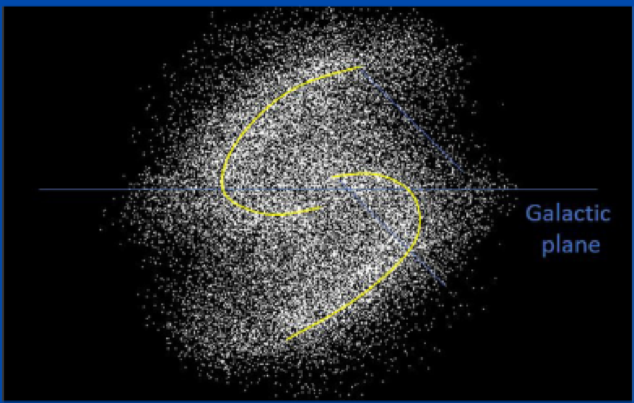

AMNH

বরফে ঘেরা সর্পিল গঠন

নিউ ইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টোরির প্ল্যানেটারিয়ামের একটি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিকালে হঠাৎ করেই একটি সর্পিল গঠন আবিষ্কৃত হয় ওয়ার্ট ক্লাউডে—যা সৌরজগতকে ঘিরে থাকা বরফজাত বস্তুতে পূর্ণ একটি অঞ্চল। 'Encounters in the Milky Way' নামের প্রজেক্টে তারা বাস্তব উপাত্ত ব্যবহার করে ভিজ্যুয়াল তৈরি করছিলেন, তখনই এই আবিষ্কার ঘটে। আগে ওয়ার্ট ক্লাউডকে সমতল বা গোলাকার ভাবা হতো। এটি সরাসরি দেখা যায়নি, বরং ধূমকেতুর গতিবিধি বিশ্লেষণ করেই বোঝা হতো।

মরুভূমিতে বিদ্যুৎ খামার

এই অ্যারিয়াল ছবিটি চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কুবুচি মরুভূমিতে নির্মাণাধীন একটি বিশাল নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পের—"Kubuqi Desert Ordos Central-Northern New Energy Base"। এটি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত। সম্পূর্ণ নির্মাণ শেষ হলে এটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎ খামার। এর পরিমাণ ৮০০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি হবে এবং এতে সৌর, বায়ু ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবকাঠামো একত্রে থাকবে।

Lian Zhen/Xinhua/Alamy

Astrobotic

কিউব রোভার

পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা Astrobotic জানিয়েছে, তাদের জুতার বাক্স আকৃতির রোভারটি এখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এটি CubeRover-1 নামের একটি রোভার, যেটি মহাকাশ ও চাঁদের পরিবেশে কেমন পারফর্ম করবে তা যাচাই করতে একাধিক পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছিল মহাকাশের তাপমাত্রা ও চাপের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পরীক্ষা। এছাড়াও, অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে রোভারটির ইন্টার‍্যাকশন পর্যবেক্ষণ করা হয়। এটি Griffin-1 মিশনের অংশ, যেটি এই বছরেই উৎক্ষেপণ হওয়ার কথা।

সমুদ্রতলে বন পুনরুদ্ধার

গ্রিসের গায়ারোস দ্বীপের চারপাশে বিজ্ঞানীরা একটি সমুদ্রতলের বাদামি শৈবাল (Cystoseira) বনের পুনরুদ্ধার করছেন। এই সামুদ্রিক শৈবাল সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, বিশেষ করে পানির উচ্চ তাপমাত্রার ফলে, এটি প্রজননে সমস্যায় পড়ছে। গবেষকরা এমন অঞ্চলে গিয়ে কাটিং সংগ্রহ করছেন যেখানে শৈবাল ভালো অবস্থায় আছে, সেগুলো ল্যাবে সিরামিক ডিস্কে চাষ করছেন, এবং পরে গায়ারোসের প্রবালপ্রাচীরে তা স্থানান্তর করছেন। এ প্রচেষ্টা পরিচালনা করছে হেলেনিক সেন্টার ফর মেরিন রিসার্চ। এই "REEForest" নামের বৃহৎ ইউরোপীয় প্রকল্পের লক্ষ্য হলো সমুদ্রজীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার।

Stelios Misinas/Reuters

AFP/Getty

আগ্নেয়গিরির ছাই মেঘ

ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপের লেউওটোবি লাকি-লাকি আগ্নেয়গিরি ১৭ জুন, ২০২৫ এ এক বিশাল অগ্নুৎপাতে ১০ কিলোমিটারের বেশি উচ্চতায় ছাই মেঘ ছুড়ে দেয়। ফলে স্থানীয় প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করে এবং আগ্নেয়গিরির চারপাশে ৮ কিমি এলাকায় 'ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল' ঘোষণা করে। এর ফলে বালির ই গুস্তি নুরাহ রাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অনেকগুলো ফ্লাইট বাতিল করা হয়। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই আগ্নেয়গিরিটি প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ারের অংশ এবং ২০২৫ সালে এটি অন্তত চারবার অগ্নুৎপাত করেছে।

হাজার রঙের ছায়াপথ

চিলিতে অবস্থিত ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির "ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ" ব্যবহার করে তোলা স্কাল্পটার গ্যালাক্সির এই অসাধারণ ছবিটি হাজারো রঙে ভরা। আগের ছবিগুলোতে যেখানে হাতে গোনা কয়েকটি রঙ থাকত, এখানে রয়েছে অসংখ্য রঙ—যা নক্ষত্র, গ্যাস, ধূলিকণা এবং ছায়াপথ গঠনের বিভিন্ন উপাদান থেকে নির্গত আলোকে উপস্থাপন করছে। এই বিশদ মানচিত্র বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিদরা গ্যালাক্সিটির বয়স, গঠন ও গতিশীলতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ESO/E. Congiu et al.

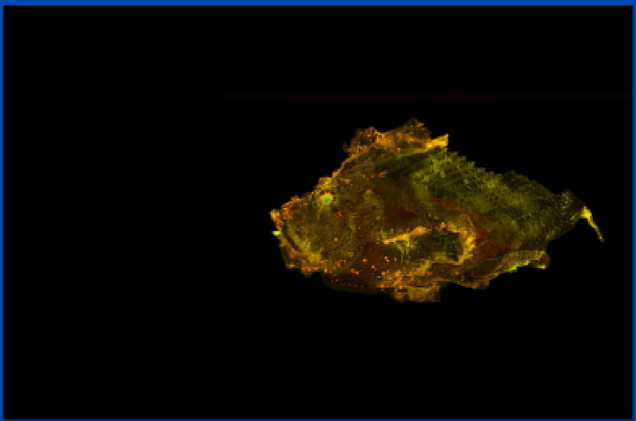

John Sparks & David Gruber

জ্বলে ওঠা মাছ

এই পাতার মতো দেখতে স্করপিয়নফিশ (***Taenianotus triacanthus***) এমন অনেক মাছের মধ্যে একটি যেগুলোর শরীরে বায়োফ্লুরোসেন্স দেখা যায়, অর্থাৎ এরা আলো শোষণ করে তা উজ্জ্বল রঙে পুনরায় নিঃসরণ করে। জুন মাসে প্রকাশিত দুটি গবেষণাপত্র এই জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন সম্পর্কে নতুন তথ্য দিয়েছে। তাতে দেখা গেছে, গত ১১.২ কোটি বছরে এই বৈশিষ্ট্যটি মাছদের মধ্যে স্বাধীনভাবে অন্তত ১০০ বার বিবর্তিত হয়েছে, এবং এতে অনেক বেশি রঙের বৈচিত্র্য রয়েছে যা আগে ধারণা করা হয়নি।

জীববিজ্ঞান

কোষীয় জগতের এক নতুন রহস্য উন্মোচন

গবেষকরা একটি নতুন কোষীয় গঠন "হেমিফুসোম" আবিষ্কার করেছেন, যা দুইটি ভিন্ন ভেসিকলের আংশিক সংযুক্ত অবস্থায় তৈরি হয় এবং যার সাথে থাকে একটি প্রোটিওলিপিড ন্যানোড্রপলেট। এই গঠন মাল্টিভেসিকুলার বডি (MVB) তৈরির একটি বিকল্প, ESCRT-স্বাধীন প্রক্রিয়ার প্রমাণ দিতে পারে।

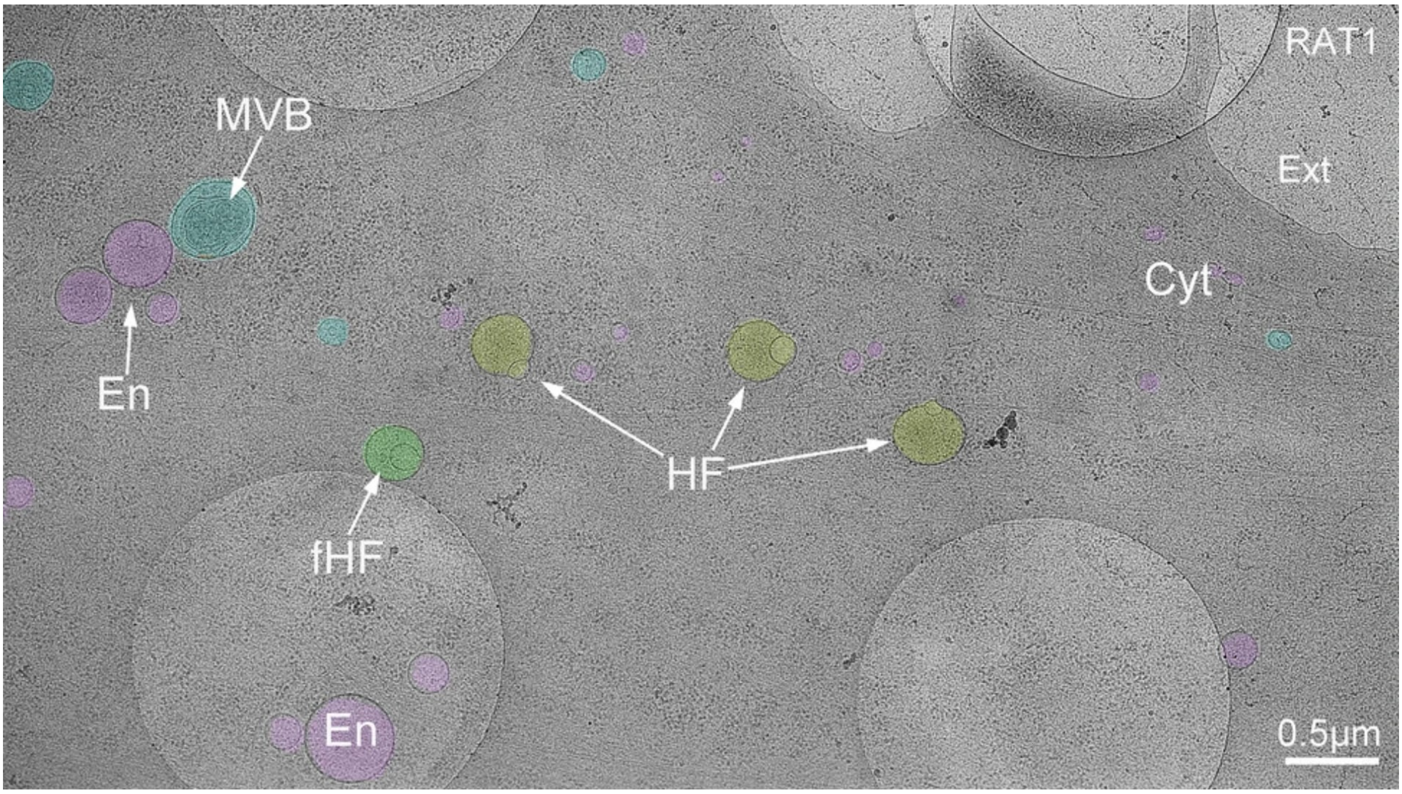

০.৫ মাইক্রোমিটার স্কেলে ক্রায়ো-ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তোলা একটি RAT-1 কোষের অগ্রপ্রান্তের ছবি। ছবির উপরের ডান কোণে থাকা ল্যামেলিপোডিয়া ও ফিলোপোডিয়া কোষের সীমানা নির্দেশ করে, যা সাইটোপ্লাজমকে (Cyt) বহিঃকোষীয় স্থান (Ext) থেকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন ভেসিকুলার অঙ্গাণুকে বিভিন্ন রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে: প্রাথমিক এন্ডোসোম সদৃশ ভেসিকল (En, গোলাপি), মাল্টিভেসিকুলার বডি বা MVB (নীল), হেমিফুসোম (HF, হলুদ), এবং ফ্লিপড হেমিফুসোম (fHF, সবুজ) [Tavakoli et al./Nature Communications]

মানবদেহের কোষগুলো এক একটি আশ্চর্য জৈব-কারখানা, যেখানে প্রতিনিয়ত চলে বিপুল পরিমাণ জৈবিক কার্যক্রম। কোষের ভেতরের বিভিন্ন ঝিল্লি-আবৃত অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে তথ্য ও উপাদান আদান-প্রদান হয় নানা রকম জটিল পথে। এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্য হলো মাল্টিভেসিকুলার বডি (MVB)-এর গঠন। সম্প্রতি *Nature Communications* জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা এমনই এক রহস্যময় কাঠামো শনাক্ত করেছেন, যার নাম দিয়েছেন হেমিফুসোম (Hemifusome)।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া স্কুল অফ মেডিসিন এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ-এর বিজ্ঞানীরা ক্রায়ো-ইলেক্ট্রন টমোগ্রাফি (cryo-electron tomography) ব্যবহার করে এই নতুন ধরনের কোষীয় গঠন আবিষ্কার করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, এই হেমিফুসোম হলো এমন এক ধরণের ঝিল্লিযুক্ত অঙ্গাণু যেটিতে দুটি ভিন্ন আকৃতির ভেসিকল (ঝিল্লি-বেষ্টিত থলি) একে অপরের সাথে হেমিফিউশন অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ তারা আংশিকভাবে যুক্ত, কিন্তু পুরোপুরি মিশে যায় না।

আরো দেখা গেছে, এই হেমিফুসোমগুলোর এক প্রান্তে থাকে ৪২ ন্যানোমিটার আকারের একটি অনন্য প্রোটিওলিপিড ন্যানোড্রপলেট (PND), যা হয়তো এই কাঠামোর গঠন ও স্থায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাধারণত কোষে ঝিল্লি ফিউশন স্বল্পমেয়াদি হয়, তবে হেমিফুসোমের হেমিফিউশন ডায়াফ্রাম দীর্ঘস্থায়ী ও বিস্তৃত, যা একে অনন্য করে তোলে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, গবেষকরা মনে করেন এই হেমিফুসোমই হতে পারে MVB গঠনের এক বিকল্প পথ। এতদিন ধরে যেসব MVB গঠনের জন্য ESCRT প্রোটিন কমপ্লেক্স দায়ী ছিল বলে ধারণা করা হতো, হেমিফুসোম তা ছাড়াও নিজস্বভাবে ভেতরে ছোট ভেসিকল তৈরি করতে পারে। এ যেন কোষের ভেতরে কোষ তৈরি হবার এক অভিনব প্রক্রিয়া—যাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন ‘de novo vesiculogenesis’।

এই আবিষ্কার শুধু কোষীয় প্রক্রিয়াকে নতুন আলোকে দেখায় না, বরং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্যও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। কোষের মেমব্রেন-সংক্রান্ত যেসব রোগের সঙ্গে আমরা পরিচিত (যেমন নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজঅর্ডার কিংবা কিছু ধরনের ক্যান্সার) সেগুলোর প্যাথলজি বুঝতেও এই গবেষণা সহায়ক হতে পারে।

হেমিফুসোম নামের এই অর্গানেল (organelle) আমাদের কোষীয় জগতের অজানা একটি স্তরকে উন্মোচিত করেছে। এর প্রকৃত কার্যকারিতা ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বুঝতে আরও গবেষণার প্রয়োজন হলেও, এটি নিঃসন্দেহে কোষবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠেছে।

লেখক: অরুণিমা তানহা

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41467-025-59887-9

মস্তিষ্ক

চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ

গবেষণায় দেখা গেছে, চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখার সময় মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয় থাকে। এআই বেশি ব্যবহার করলে সৃজনশীলতা ও চিন্তার অভ্যাস কমে যেতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। তবে গবেষণাটি প্রাথমিক পর্যায়ে বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে না।

OpenAI

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে প্রবন্ধ লেখে, তাদের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয় থাকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) আমাদের চিন্তা-শক্তিকে অলস করে দিচ্ছে কিনা, তা নিয়ে চলমান গবেষণার অংশ হিসেবেই এই গবেষণাটি করা হয়েছে।

ম্যাসাচুসেটসের MIT মিডিয়া ল্যাবের কম্পিউটার বিজ্ঞানী নাটালিয়া কসমিনা এবং তাঁর সহকর্মীরা বোস্টনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এই গবেষণা চালান। তাদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়: একটি দল শুধুমাত্র ChatGPT (GPT-4o) ব্যবহার করে প্রবন্ধ লেখে, আরেক দল গুগল সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে (কোনও AI সহায়তা ছাড়াই), তৃতীয় দলকে ইন্টারনেট ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

সকল অংশগ্রহণকারীর মাথায় ইইজি (EEG) হেডসেট পড়িয়ে রাখা হয়, যা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ রেকর্ড করে। এতে দেখা গেছে, যারা ইন্টারনেট ছাড়াই প্রবন্ধ লিখেছে, তাদের মস্তিষ্কে সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে, বিশেষ করে মস্তিষ্কের পিছন থেকে সামনের সিদ্ধান্তগ্রহণ অংশ পর্যন্ত। এদের মনে রাখার ক্ষমতাও বেশি ছিল।

গুগল ব্যবহারকারীদের মধ্যে মস্তিষ্কের দৃষ্টি ও স্মৃতিসম্পর্কিত এলাকায় বেশি সক্রিয়তা দেখা গেছে। আর যারা চ্যাটবট ব্যবহার করেছে, তাদের মস্তিষ্কের সক্রিয়তা সবচেয়ে কম ছিল।

যারা প্রথমে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে পরে তা বাদ দিয়ে লেখে, তাদের মস্তিষ্ক কিছুটা বেশি সক্রিয় হয় — কিন্তু যারা প্রথম থেকেই কোনও অনলাইন টুল ছাড়া লিখেছে, তাদের মতো নয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার বেশি হলে সৃজনশীলতা ও চিন্তার অভ্যাস দুর্বল হতে পারে।

তবে গবেষণাটি প্রাথমিক পর্যায়ে, এতে অংশগ্রহণকারী ছিল অল্পসংখ্যক (মাত্র ৬০ জন), এবং গবেষণাটি এখনো পিয়ার-রিভিউড নয়। তাই নাটালিয়া কসমিনা নিজেই বলেছেন, "এই গবেষণাটি শক্তভাবে বলছে না যে এআই ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্ক বোকা হয়ে যাচ্ছে।" এই গবেষণার ফলাফলকে অতিরঞ্জিত করে ব্যাখ্যা না করাই ভালো।

গবেষণায় একটি অদ্ভুত ফলাফলও পাওয়া গেছে—যারা প্রথমে নিজেরাই লিখে পরে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে, তাদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বরং বাড়ে। অর্থাৎ, AI কখন ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ গুইডো ম্যাকরানস্কি বলছেন, AI-ভিত্তিক চ্যাটবট যদি শিক্ষার্থীদের উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করতে শেখায়, তাহলে তা বেশি উপকারী।

চ্যাটজিপিটি ও AI টুল ব্যবহারে কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক কম সক্রিয় হয়, বিশেষত যখন টুলের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয়। তবে AI কখন ও কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাই আসল চাবিকাঠি — যা ভবিষ্যতের শিক্ষা ও সৃজনশীলতায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

লেখক: জান্নাত শেখ

রেফারেন্স: *DOI: 10.48550/arXiv.2506.08872*

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

ড্রাগন ম্যানের খুলিতে ডেনিসোভানদের রহস্যভেদ!

চীনে পাওয়া একটি প্রাচীন খুলির প্রোটিন ও দাঁতের প্লাক বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো নিশ্চিতভাবে ডেনিসোভানদের চেহারার ধারণা পেয়েছেন। 'ড্রাগন ম্যান' নামে পরিচিত এই খুলিটি তাদের মস্তিষ্কের আকার, মোটা ভ্রু ও শারীরিক গঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে।

Xijun Ni

ডেনিসোভান—এই নামটা প্রাগৈতিহাসিক মানবজাতির এক রহস্যময় শাখার প্রতিনিধিত্ব করে, যাদের অস্তিত্ব আমরা এতদিন কেবল সাইবেরিয়ার একটি গুহার আঙুলের হাড় ও ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতাম। কিন্তু সম্প্রতি চীনের হারবিন শহরের কাছে পাওয়া একটি পুরনো খুলি সেই অজানা মুখগুলোকে অবশেষে কিছুটা চেনা রূপ দিয়েছে। একে বিজ্ঞানীরা 'ড্রাগন ম্যান' বলে ডাকছেন, আর এই খুলিই এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রথম সম্পূর্ণ ডেনিসোভান করোটির নমুনা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই ফসিলটি অন্তত ১,৪৬,০০০ বছর পুরনো। খুলিটির গঠন, বিশাল মস্তিষ্কের আকার, মোটা ভ্রু-রিজ ইত্যাদি আধুনিক মানুষ ও নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়, যা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে ডেনিসোভানরা দেখতে কিছুটা আমাদের মতোই ছিল। ২০১৮ সালে একজন নাম না-জানা ব্যক্তি খুলিটি প্যালিওন্টোলজিস্ট ছিয়াং জিকে হস্তান্তর করেন, যিনি পরে জানতে পারেন এটি বহু বছর আগে সেতু নির্মাণের সময় পাওয়া গিয়েছিল এবং একটি পরিত্যক্ত কূপে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

John Gurche/Mark Thiessen/Nat Geo Image Collection

২০২১ সালে এটিকে *Homo longi* নামে একটি আলাদা প্রজাতি বলা হলেও, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে

এই খুলিটি ছিল একজন ডেনিসোভানের। মূল চাবিকাঠি ছিল খুলির ভেতরের প্রাচীন প্রোটিন এবং দাঁতের উপর জমা পুরাতন ক্যালকুলাস (ক্যালসিফায়েড ডেন্টাল প্লাক)। গবেষক কিয়াওমেই ফু ও তাঁর দল ৯৫টি প্রাচীন প্রোটিনের টুকরো বিশ্লেষণ করে ডেনিসোভানদের ডিএনএ-এর সঙ্গে মিল খুঁজে পান। এমনকি দাঁতের প্লাক থেকে বের করা মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ-ও সাইবেরিয়ার ডেনিসোভানদের সঙ্গে মিল খায়।

"ফসিলটি অন্তত ১,৪৬,০০০ বছর পুরনো"

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—এই প্রথম কোনো প্লেইস্টোসিন যুগের দাঁতের প্লাক থেকে সফলভাবে হোস্ট ডিএনএ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গবেষকদের মতে, এই আবিষ্কার অন্যান্য প্রাচীন নমুনাগুলোর বিশ্লেষণেও নতুন পথ দেখাবে, এমনকি যখন ডিএনএ বা প্রোটিন পুরোপুরি সংরক্ষিত না থাকে।

এখন বিজ্ঞানীদের হাতে এমন একটি খুলির রেফারেন্স রয়েছে যা দিয়ে ভবিষ্যতের অনেক ফসিল চিহ্নিত করা সম্ভব হবে, এমনকি যদি তাতে ডিএনএ বা প্রোটিন না-ও থাকে। প্রাগৈতিহাসিক মানবজাতির এই নতুন চেহারা আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসে আরেকটি উঁকি দিল—এবং একঝলক পরিচয় এনে দিল হারিয়ে যাওয়া সেই ডেনিসোভানদের, যাদের মুখ এতদিন ছিল কেবল কল্পনার।

এই আবিষ্কার প্রমাণ করে, প্রাচীন ডিএনএ আর প্রোটিন বিশ্লেষণ প্রযুক্তির সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের মিলবন্ধন কতটা শক্তিশালী হতে পারে। হয়তো ভবিষ্যতে আরও বহু হারিয়ে যাওয়া মানুষদের চেহারাও উঠে আসবে এমনই কোনো ফসিল থেকে, কোনো কূপের অতল অন্ধকার থেকে।

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

রেফারেন্স: DOI: [10.1016/j.cell.2025.05.040](https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.05.040), [10.1126/science.adu9677](https://doi.org/10.1126/science.adu9677)

শিক্ষা

কখন থেকে মেয়েরা গণিতে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে?

ফ্রান্সে প্রায় ৩০ লাখ শিশুর ওপর করা গবেষণায় দেখা গেছে, স্কুলে ভর্তি হওয়ার মাত্র চার মাসের মধ্যেই গণিতে ছেলেরা মেয়েদের ছাড়িয়ে যায়। শুরুর সময় তাদের পারফরম্যান্স ছিল সমান।

Asian Development Bank/Flickr

বিশ্বজুড়ে দেখা যায়, কিশোর বয়সে ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের তুলনায় গণিতে ভালো করে এবং পরবর্তী সময়ে গণিত ও এ সম্পর্কিত পেশায় পুরুষদের অংশগ্রহণ বেশি। অথচ শিশু বয়সে ছেলেদের মধ্যে সংখ্যা বোঝার বা যৌক্তিক চিন্তার কোনো প্রাকৃতিক প্রাধান্য দেখা যায় না। সম্প্রতি ফ্রান্সে প্রায় ৩০ লাখ স্কুলশিশুর ওপর করা এক বিশাল গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়েরা গণিতে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম বছরেই।

গবেষণায় দেখা যায়, স্কুলের শুরুতে ছেলেমেয়েরা গণিতে প্রায় সমান নম্বর পেলেও মাত্র চার মাস পর থেকেই ছেলেরা এগিয়ে যেতে শুরু করে। আর ১২ মাসের মধ্যেই এই পার্থক্য অনেক বড় হয়ে যায়। এই গবেষণাটি ১১ জুন, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী জিলিয়ান লাউয়ার বলেন, "এই গবেষণা বলছে, শিশুদের গণিতে মেয়েদের পিছিয়ে পড়া কোনো জৈবিক বা অবশ্যম্ভাবী বিষয় নয়। যদি আমরা মেয়েদের পিছিয়ে পড়া ঠেকাতে চাই, তাহলে স্কুলের শুরুতেই তাদের অভিজ্ঞতার দিকে নজর দিতে হবে।"

গবেষকেরা কিছু সম্ভাব্য সমাধানও দিয়েছেন: গণিতভীতি কমাতে মানসিকভাবে সহায়তা দেওয়া, ক্লাসে ছেলেমেয়েদের সমানভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া, এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরেও সমস্যা সমাধানের কৌতূহল তৈরি করা।

"নৈতিক দিক থেকে আমরা চুপ থাকতে পারি না, যখন এমন ফলাফল সামনে আসে," বলেন গবেষণাটির অন্যতম গবেষক, নিউরোবিজ্ঞানী পলিন মার্টিনো।

বড় তথ্যের গবেষণা

এই গবেষণা আগের যেকোনো গবেষণার চেয়ে বিস্তৃত। এতে ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রথমবার স্কুলে যাওয়া সব ফরাসি শিশুর তথ্য অন্তর্ভুক্ত আছে — প্রায় ৩০ লাখ পাঁচ, ছয় ও সাত বছর বয়সী শিশু। দেখা গেছে, দেশজুড়ে সব ধরনের স্কুল, অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক পটভূমির মধ্যেই একই চিত্র — মেয়েরা প্রথম বছরেই পিছিয়ে পড়ছে।

গবেষকরা বড় ডেটার সাহায্যে দেখিয়েছেন, বয়স নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুই এই পার্থক্যের সূচনা করে। ফ্রান্সে, শিশুদের স্কুল শুরু হয় তারা যেই ক্যালেন্ডার বছরে ছয় বছর পূর্ণ করে, সেই সেপ্টেম্বর মাসে। গবেষকেরা এমন শিশুদের তুলনা করেছেন যাদের জন্ম তারিখে কয়েকদিনের পার্থক্যের কারণে তারা ভিন্ন স্কুল বর্ষে পড়েছে। দেখা গেছে, যেসব ছেলে-মেয়ে ডিসেম্বরে জন্ম নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষে উঠেছে, তাদের মধ্যে গণিত পারফরম্যান্সে পার্থক্য রয়েছে। অথচ জানুয়ারিতে জন্ম নেওয়া এবং প্রথম বর্ষে থাকা একই বয়সী শিশুদের মধ্যে এই পার্থক্য নেই।

গবেষকেরা বলেন, প্রথম বছরে ছেলেমেয়ের মধ্যে গড় পারফরম্যান্সে কোনো বড় ফারাক না থাকায় বোঝা যায়, সমস্যার মূল কারণ হতে পারে স্কুল শুরু হওয়ার পর তাদের পরিবেশগত অভিজ্ঞতা।

লাউয়ার বলেন, "এটা ঠিক, কোনো অজানা জৈবিক কারণও থাকতে পারে যেটা আমরা এখনো গণিত বা স্থানিক চিন্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারিনি তবে এই গবেষণা বলছে, তাদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" শিশু বয়সে ছেলেমেয়েরা সংখ্যাবোধ ও যৌক্তিক চিন্তায় প্রায় একইরকম দক্ষতা দেখায়।

কেন পিছিয়ে পড়ে মেয়েরা?

সম্ভাব্য একটি কারণ হতে পারে শিক্ষকদের বা অভিভাবকদের আচরণ। অনেক সময়ই তারা অজান্তেই ছেলেদের গণিতে ভালো বলার বা তাদের সাফল্যকে প্রতিভা হিসেবে দেখানোর প্রবণতা দেখায়, যেখানে মেয়েদের সাফল্যকে পরিশ্রমের ফল বলা হয় — যা মেয়েদের আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলে।

স্কুলে গণিতকে আলাদা সময়সূচি ও বই দিয়ে "গণিত" হিসেবে চিহ্নিত করা হলে মেয়েরা সেসময় থেকেই এই সামাজিক স্টেরিওটাইপ নিজেদের উপর প্রয়োগ করতে শুরু করে। এছাড়া মেয়েদের মধ্যে গণিত নিয়ে ভয় বা দুশ্চিন্তা

ছেলেদের তুলনায় বেশি — ফলে সময় নির্ধারিত পরীক্ষায় তাদের পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের গবেষক মেঘনা নাগ চৌধুরী বলেন, গণিতে "ভালো" হওয়ার সংজ্ঞাও আরও বিস্তৃত করা দরকার। শুধুমাত্র দ্রুত উত্তর দেওয়াকেই দক্ষতার মাপকাঠি না ধরে, কোনো সমস্যার অভিনব সমাধান খুঁজে পাওয়াকেও সেইভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

"আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত না যে মেয়েদের ছেলেদের মতো হতে বাধ্য করে। বরং স্কুলিং-কে আরও বিস্তৃত করতে হবে।"

লেখক: সাদিয়া আনাম ইসরা

রেফারেন্স: *DOI: [10.1038/s41586-025-09126-4](https://doi.org/10.1038/s41586-025-09126-4)*

রসায়ন

প্লাস্টিক থেকে প্যারাসিটামল তৈরি

এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিকভাবে ঘটে না এমন একটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া জীবন্ত E. coli ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সফলভাবে চালিয়ে দেখিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ প্যারাসিটামল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এটি টেকসই রসায়ন ও পরিবেশবান্ধব জৈবপ্রযুক্তির এক নতুন দিগন্ত।

AI-generated

প্যারাসিটামল (যা অ্যাসিটামিনোফেন নামেও পরিচিত) ব্যথা ও জ্বর উপশমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ওষুধ। IQVIA এর তথ্যমতে বাংলাদেশ সর্বাধিক বিক্রীত ঔষধের দিক দিয়ে ৪ নম্বরে আছে নাপা (বেক্সিমকো ফার্মার তৈরি প্যারাসিটামল)। এটি সাধারণত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে প্রাপ্ত অণু দিয়ে তৈরি হয়, তবে গবেষকরা এখন এমন পদ্ধতি উন্নয়নের চেষ্টা করছেন, যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্যের মতো আরও টেকসই উৎস থেকে এই ওষুধ তৈরি করা যায়।

এক যুগান্তকারী গবেষণায়, স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে এক সময় শুধুই

ল্যাবভিত্তিক একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া (Lossen rearrangement) এখন জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া *Escherichia coli* (*E. coli*)-এর কোষে ঘটানো সম্ভব। তবে শুধু তাই নয়, তাঁরা এই প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে প্লাস্টিকের বোতল ভেঙে তৈরি এক যৌগকে কাজে লাগিয়ে জীবন্ত কোষে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ প্যারাসিটামল উৎপাদন করতেও সফল হয়েছেন।

প্রাকৃতিক উপায়ে ঘটে এমন রসায়নিক বিক্রিয়ার সংখ্যা সীমিত। অপরদিকে, জৈব-রাসায়নিক গবেষণায় বহু নতুন প্রতিক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে, যেগুলো সাধারণ জীবের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় না। গবেষকরা এমন এক জীবনোপযোগী বা biocompatible Lossen প্রতিক্রিয়ার খোঁজ পান, যা কোষের ভিতরে, পরিবেশবান্ধব ও বিষমুক্তভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। এতে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষে একটি acyl hydroxamate জাতীয় যৌগকে রূপান্তরিত করে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক para-aminobenzoic acid (PABA) তৈরি করা হয়, যা জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

এই প্রতিক্রিয়াটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখন গবেষকরা দেখান যে পেট বোতল থেকে প্রাপ্ত terephthalic acid দিয়ে এই Lossen বিক্রিয়ার সূচনাপদার্থ (substrate) বানানো সম্ভব। তার মানে, পরিত্যক্ত প্লাস্টিককে কাজে লাগিয়ে জীবাণু থেকে ওষুধ বানানো যায় — যা বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের এক দুর্দান্ত দৃষ্টান্ত।

আরও চমকপ্রদ হলো, গবেষকদল এমনভাবে ব্যাকটেরিয়াকে প্রকৌশলীভিত্তিকভাবে ডিজাইন করেন, যাতে তারা এই PABA কে পরবর্তীতে রূপান্তর করে প্যারাসিটামল (Paracetamol) তৈরিতে সক্ষম হয়। এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় একই পরিবেশে, ধাপে ধাপে, একপাত্রেই। অর্থাৎ প্লাস্টিক → Lossen প্রতিক্রিয়া → PABA → Paracetamol, সবটাই হয় জীবন্ত কোষের ভিতরে।

এই গবেষণা কেবল একটি নতুন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া জীববিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিশা দেখায়, যেখানে প্লাস্টিক দূষণ কমিয়ে তা থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে যা চিকিৎসা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

লেখক: জারা জাইন্ড

রেফারেন্স: *DOI: [10.1038/s41557-025-01845-5](https://doi.org/10.1038/s41557-025-01845-5)*

জেনেটিক্স

শুধুই বাবার জিন দিয়ে সন্তানের জন্ম

বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র দুটি পিতৃসূত্রের জিন দিয়ে প্রজননক্ষমও ইঁদুর তৈরি করেছেন।

মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী সাধারণত মা ও বাবার কাছ থেকে পাওয়া দুটি জিনগত অবদান নিয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু সাম্প্রতিক এক চমকপ্রদ গবেষণায় চীনের শাংহাই জিয়াও তং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত দুটি শুক্রাণুর জিন ব্যবহার করে সফলভাবে পূর্ণাঙ্গ, সুস্থ এবং প্রজননক্ষম পুরুষ ইঁদুর তৈরি করেছেন। এই গবেষণাটি অ্যান্ড্রোজেনেসিস, অর্থাৎ শুধুমাত্র পুরুষ প্রাণীর জিনগত উপাদান ব্যবহার করে যৌনবিহীন প্রজননের ক্ষেত্রে এক অভুতপূর্ব সাফল্য।

আমরা আগেও ল্যাবে ইঁদুরের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোজেনেসিস সফল হতে দেখেছি: চলতি বছরের শুরুতে গবেষকরা দু'টি পুরুষের জিনগত উপাদান ব্যবহার করে ইঁদুর তৈরি করতে পেরেছিলেন, যেখানে ডিম্বাণুতে মায়ের জিন ছিল না। তবে সেই ইঁদুরের বাচ্চাগুলো বন্ধ্যা ছিল এবং প্রজনন করতে সক্ষম হয়নি।

Yanchang Wei

গবেষকরা এটাও দেখিয়েছেন, কেন একমাত্র পিতামাতার জিনযুক্ত (অর্থাৎ অ্যান্ড্রোজেনেটিক) স্তন্যপায়ী ভ্রূণ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না, এবং সেই বাধা কীভাবে অতিক্রম করা সম্ভব। মূল বাধাটি হলো জিনোমিক ইমপ্রিন্টিং নামক এক ধরনের উপযুক্ত জিন সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার ছাঁচ, যা একটি জিন মায়ের দিক থেকে এসেছে না বাবার দিক থেকে, তার উপর নির্ভর করে।

এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে বিজ্ঞানীরা সাতটি গুরুত্বপূর্ণ ইমপ্রিন্টিং কন্ট্রোল রিজিয়ন (ICRs) এর নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে DNA মিথাইলেশন (methylation) সম্পাদনার মাধ্যমে জিনের সক্রিয়তা নির্ধারণ করেছেন। অত্যাধুনিক CRISPR ভিত্তিক এপিজেনেটিক এডিটিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁরা একাধিক ICR–এ জিনগত ছাপ ঠিক করেছেন, যেন শুধু পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত জিন দিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর বিকাশ সম্ভব হয়।

এই পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দুটি পৃথক শুক্রাণু থেকে নেওয়া জিন একত্র করে মায়ের ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস বাদ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন। এরপর সংশোধিত ভ্রূণগুলোকে একটি প্রতিস্থাপিত মা ইঁদুরের গর্ভে প্রতিস্থাপন করে দেখা যায়, কয়েকটি ইঁদুর পূর্ণ বয়সে পৌঁছেছে এবং এমনকি প্রজননক্ষমও হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, সব ভ্রূণই সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি; অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু হয়েছে গর্ভকালীন শেষভাগে। এটি বোঝায় যে, জিনোমিক ইমপ্রিন্টিং-এর নিখুঁত সামঞ্জস্য না থাকলে বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তবে যে দুটি পুরুষ ইঁদুর বেঁচে থাকে, তাদের সব সাতটি ICR–এ উপযুক্ত মিথাইলেশন ছিল এবং তারা স্বাভাবিকভাবে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।

এই গবেষণা একদিকে যেমন স্তন্যপায়ী জীবনে একক পিতৃত্ব দিয়ে প্রজননের দ্বার উন্মোচন করল, তেমনই জিন-সম্পাদনার মাধ্যমে উন্নত প্রজনন প্রযুক্তি, জিনগত রোগ নিরাময় এবং স্টেম সেল থেরাপিতে বিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করল।

তবে গবেষকরা সতর্ক করেছেন—এই প্রযুক্তি এখনো নিখুঁত নয়, এবং মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীতে প্রয়োগের আগে আরও গবেষণা ও নৈতিক চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে।

লেখক: সাদিয়া ইসলাম বর্ষা

রেফারেন্স: DOI: 10.1126/science.adt0672

গণিত

শূন্য দিয়ে ভাগ কেন বিপজ্জনক?

গণিতের ক্ষেত্রে আমরা কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলি। তার মধ্যে একটি নিয়ম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, শূন্য দিয়ে ভাগ করা যাবে না। কিন্তু শূন্য দিয়ে ভাগ করতে গেলে এত ঝামেলা হয় কেন, আর চেষ্টা করলে ঠিক কী হয়?

প্রথমে চলুন ভাগ বা ডিভিশন কী জিনিস সেটা বুঝি। ধরুন, আপনি ১০ কে ২ দিয়ে ভাগ করছেন। এর মানে হলো আপনি জানতে চাচ্ছেন:

“২ কে কতবার যোগ করলে ১০ হয়?” (উত্তর: ৫ বার), অথবা

“২ এর সাথে কোন সংখ্যা গুণ করলে ১০ হয়?” (উত্তর: ৫)

ভাগ হলো গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া। কোনো একটি সংখ্যাকে যদি অন্য একটি সংখ্যার সঙ্গে গুণ করা হয়, তাহলে সেই গুণফলকে আবার আগের সংখ্যায় ফেরত পেতে আমরা যে সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করি, তাকে বলে গুণের বিপরীত সংখ্যা বা রেসিপ্রোকাল। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, কোনো কিছুকে ২ দিয়ে গুণ করলে সেটার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। এখন যদি সেই দ্বিগুণ সংখ্যাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চান, তাহলে সেটাকে ২-এর গুণাত্মক বিপরীত অর্থাৎ ১ ÷ ২ বা ½ দিয়ে গুণ করতে হবে। তখন আবার আগের সংখ্যাই ফিরে আসবে।

এবার ভাবুন, আপনি শূন্য দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করছেন। এর মানে হলো আপনি এমন একটি সংখ্যা খুঁজছেন, যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে আপনার আসল সংখ্যাটি ফিরে আসবে। কিন্তু যেকোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে সবসময় শূন্যই হয়। সমস্যাটা এখানেই, শূন্যের কোনো গুণাত্মক বিপরীত নেই। এমন কোনো সংখ্যা নেই যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায়। শূন্যের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাধারণ ভাগের মতো শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না।

শূন্যের ধারণাটা নিজেই গণিতের ইতিহাসের এক দারুণ যাত্রা। অ্যারিস্টটল, পিথাগোরাস, ইউক্লিডের মতো প্রাচীনকালের বড় বড় পণ্ডিতরা শূন্যের ধারণাটি সেভাবে বুঝতেই পারেননি। ‘কিছুই না’ মনে হলেও, শূন্য গণিতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় আবিষ্কার।

আধুনিক গণিতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আসে নবম শতাব্দীর শুরুতে, পারস্যের বিখ্যাত গণিতবিদ মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি-র হাত ধরে। তাকে প্রায়ই "বীজগণিতের জনক" বলা হয়, কারণ তার রচিত *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala* গ্রন্থ থেকেই "Algebra" শব্দটির উৎপত্তি।

তিনি ভারতীয় হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গবেষণা করেন, যেটি ছিল স্থানীয় মানভিত্তিক — অর্থাৎ, একটি সংখ্যার মান নির্ধারিত হতো সংখ্যাটির অবস্থানের ওপর (যেমন একক, দশক, শতক ইত্যাদি)। এ পদ্ধতিতে মোট ৯টি অঙ্ক ব্যবহৃত হতো এবং বড় সংখ্যাগুলো প্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই অঙ্কগুলো বসানো হতো।

এই পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করতে ভারতীয় গণিতবিদরা যেভাবে 'শূন্য' সংখ্যাটিকে স্থানধারক হিসেবে ব্যবহার করতেন, খাওয়ারিজমিও সেই ধারণাকে গ্রহণ করেন এবং তার লেখার মাধ্যমে তা আরববিশ্বে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই গোলাকার প্রতীক "০" ব্যবহারের ফলে ১ আর ১০, কিংবা ১০০-এর মতো সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার বোঝা যেত, যা ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ এবং গণনার নির্ভুলতার জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও তিনি নিজে স্থানীয় মান পদ্ধতি কিংবা শূন্যের আবিষ্কারক নন, তবে এই ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রসারে তার অবদান ছিল অসাধারণ। তার কাজই ইউরোপে হিন্দু-অ্যারাবিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রবেশের অন্যতম ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

সময়ের সাথে সাথে শূন্য শুধু একটি স্থানধারক না থেকে নিজেই একটি সংখ্যায় পরিণত হয়। সংখ্যা রেখায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার মাঝখানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু হিসেবে কাজ করে, যা আমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি তৈরি করে। শূন্য না থাকলে, একটি সংখ্যা এবং তার ঋণাত্মক প্রতিরূপ যোগ করার মতো অপারেশনগুলো অসংজ্ঞায়িত থাকত, এবং সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক অসম্পূর্ণ থাকত।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, "শুধু 'অসীম' বললেই তো হয়, শূন্য দিয়ে ভাগ করলে উত্তর অসীম—এটাই তো বোঝাচ্ছে!" কিন্তু আসল ব্যাপারটা এতটা সহজ নয়।

চলুন একটু বুঝে নেই। আপনি যদি ১০ কে ১ দিয়ে ভাগ করেন, পাবেন ১০। ০.১ দিয়ে ভাগ করলে পাবেন ১০০। ০.০১ দিয়ে ভাগ করলে পাবেন ১০০০। এভাবে ভাগের মান ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। অর্থাৎ, ভাজক যত ছোট হয়, ভাগফল তত বড় হয়। এই ধারাবাহিকতা দেখে মনে হতে পারে, শূন্যের কাছাকাছি গেলে উত্তর 'অসীম' হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এখানে একটি জটিলতা আছে। যদি আপনি ১০ কে ঋণাত্মক ছোট সংখ্যাগুলো (যেমন -০.১, -০.০১) দিয়ে ভাগ করেন, তখনও ফলাফল বাড়তে থাকে, কিন্তু ঋণাত্মক দিকে। যেমন ১০ ÷ -০.১ = -১০০। তাই শূন্যের দুই দিক থেকেই (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) ভাগফল 'অসীম'-এর দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে—একটি ধনাত্মক অসীম, আরেকটি ঋণাত্মক অসীম।

এই দ্বিমুখী প্রবণতা আমাদের সামনে একটা সমস্যার জন্ম দেয়। কারণ, শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ঠিক কোন দিকের অসীম পাওয়া যাবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। একই গণনায় দুটি ভিন্ন উত্তর—এটা তো আর গণিতের নিয়মে চলে না! তাই সাধারণ গণিতে শূন্য দিয়ে ভাগ করাকে 'অসংজ্ঞায়িত' বা Undefined বলা হয়। অর্থাৎ, এই ভাগফলটা কোনো নির্দিষ্ট মান দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়।

গণিতের ইতিহাসে দেখা গেছে, অনেক সময় পুরনো নিয়ম ভেঙে নতুন ধারণা তৈরি করা হয়েছে, যাতে জটিল বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। যেমন, একসময় ঋণাত্মক সংখ্যা কিংবা ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল (যেমন, কাল্পনিক সংখ্যা 'i') ছিল খুবই বিভ্রান্তিকর ধারণা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এগুলোর সঠিক সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে, আর আজ সেগুলো আধুনিক গণিতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তাহলে প্রশ্ন আসে, আমরাও কি শূন্য দিয়ে ভাগ করাকে "অসীম" হিসেবে ধরে নিতে পারি?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, উত্তরটা হলো না। কারণ, এমন সংজ্ঞা দিলে দ্রুতই আমরা এমন সব সমস্যায় পড়ে যাব যা গোটা গাণিতিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলবে।

চলুন একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝি।

ধরা যাক, ০ × ∞ = ১

অর্থাৎ, অসীম হচ্ছে শূন্যের গুণফলের বিপরীত (reciprocal)।

তাহলে,

(০ × ∞) + (০ × ∞) = ১ + ১ = ২ — এটা একদম পরিষ্কার।

কিন্তু আমরা জানি গুণফলকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে (associative law) লিখতে পারি: ০ × (∞ + ∞)

এখন, ∞ + ∞ তো আবার ∞, তাই: ০ × ∞ = ১ — আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়।

এই দুটো সমীকরণ থেকে বের হয়ে আসে অদ্ভুত এক ফলাফল: ১ = ২

এটা তো একেবারেই অগ্রহণযোগ্য! যদি ১ আর ২ সমান হয়ে যায়, তাহলে গোটা সংখ্যা পদ্ধতি অর্থহীন হয়ে যাবে। আর তাই, ০ × ∞ = ১ বা এরকম কোনো সংজ্ঞা গণিতে দেওয়া যায় না।

এই কারণেই, শূন্য দিয়ে ভাগ করাকে “অসীম” বলা যতটা সহজ শোনায়, বাস্তবে তা ততটাই বিপজ্জনক। বরং এভাবে বলাই ঠিক—শূন্য দিয়ে ভাগ অসংজ্ঞায়িত (undefined), কারণ এর কোনো সঠিক মান নির্ধারণ করা সম্ভব নয় যে মান গণিতের বাকি নিয়মগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

শূন্য দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করলে এমন সব সমস্যা তৈরি হয়, যেগুলো গাণিতিক নিয়মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ধরুন, যদি আমরা বলি যে কোনো সংখ্যা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ফলাফল “অসীম” হবে, তাহলে সেই অসীমকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে আবার মূল সংখ্যাটি ফিরে আসা উচিত, কারণ গুণ এবং ভাগ একে অপরের বিপরীত। কিন্তু বাস্তবে, শূন্য দিয়ে যত কিছুই গুণ করি না কেন, ফলাফল সবসময় শূন্যই হয়। কাজেই এমন কোনো সংখ্যা নেই যেটিকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায়। এটাই দেখায়, শূন্য দিয়ে ভাগ করার কোনো অর্থই দাঁড়ায় না।

সহজভাবে বললে, শূন্য দিয়ে ভাগ মানে হলো এমন কিছু চাওয়া, যার কোনো বাস্তব বা গাণিতিক ভিত্তি নেই। উদাহরণস্বরূপ, ৮ টুকরা পিৎজা শূন্য জন মানুষের মধ্যে ভাগ করতে চাইলে সেটা সম্ভব নয়, কারণ কেউই নেই যে সেই টুকরোগুলো পাবে! এমনকি যদি শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করতে চান, তাহলেও সমস্যার সমাধান নেই—কারণ একে অনেকভাবে ব্যাখ্যা গেলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কোনটি সঠিক।

তবে গণিত শুধু সংখ্যা নিয়ে খেলা নয়, বরং এটা এক বিশাল কাঠামো যার ভেতরে নানা জটিল ধারণা রয়েছে। কিছু উন্নত গাণিতিক শাখা যেমন প্রজেক্টিভ জ্যামিতি বা রিম্যান স্ফিয়ার, সেখানে “অসীম” বা শূন্য নিয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করা হয়। যেমন রিম্যান স্ফিয়ারে, জটিল সংখ্যাগুলোকে একটি গোলকের উপর কল্পনা করা হয়, যেখানে গোলকের উপরের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে অসীম হিসেবে ধরা হয়। এতে করে 1/0 = ∞-এর মতো ভাবনাগুলো কিছু নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। তবে এই ধারণাগুলো সাধারণ গণিতের অংশ নয়; এগুলো গবেষণামূলক এবং বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জায়গা।

শেষ কথা হলো, শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না—এটা কোনো রকম চাপিয়ে দেয়া নিয়ম নয়, বরং গণিতের গভীর গঠনগত সত্য। শূন্য দেখতে “কিছুই না” মনে হলেও, এটি সংখ্যাতত্ত্বের এক মৌলিক স্তম্ভ। আর এই নিষেধাজ্ঞা গণিতের অন্তর্নিহিত যুক্তি এবং সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এক অনিবার্য সুরক্ষা।

লেখক: রামিছা আলী সালওয়া

শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রসায়ন

প্রায় সব জীব কেন অক্সিজেন গ্রহণ করে?

আমরা সাধারণত অক্সিজেনকে জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখি, নির্বিঘ্নে শ্বাস নেওয়ার উপাদান, জীবনধারণের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু অক্সিজেন আসলে রাসায়নিক ভাবে অত্যন্ত সক্রিয় (reactive) মৌল। আপনি কাঠ পোড়ানোর

সময় দেখে থাকবেন যে অক্সিজেন কতটা সক্রিয়ভাবে জ্বালানি পোড়াতে সাহায্য করে। তাহলে প্রশ্ন হলো, এত জীবের জীবনধারণের জন্য কেন এই রিঅ্যাক্টিভ মৌলটি এত গুরুত্বপূর্ণ?

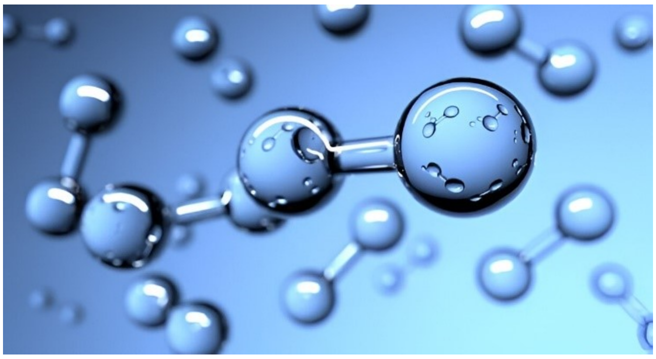

Just_Super/iStock

জীবজগতে হাজার রকমের বিপাকক্রিয়া (metabolism) বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে জীবন টিকে থাকে। কিন্তু প্রায় সব ইউক্যারিওট (যাদের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে) এবং বহু প্রোক্যারিওট (যাদের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না) অক্সিজেন ব্যবহার করে বেঁচে থাকে।

এখানে মূলত হেটারোট্রোফদের (heterotroph) কথা বলা হচ্ছে। হেটারোট্রোফ হলো এমন সব জীব যারা নিজেদের পুষ্টি ও শক্তি পায় অন্য জৈব পদার্থ খেয়ে, যেমন মানুষ। তবে সবাই এমন না—উদ্ভিদের মতো কিছু জীব নিজের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন নেয় বাতাসের CO_2 থেকে, যদিও শক্তির জন্য অন্য উৎস লাগে।

অক্সিজেনের রসায়ন: শক্তি তৈরির কারখানা

হেটারোট্রোফরা যখন খাবার খায়, তখন সেই জৈব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন ছিঁড়ে নেয়। এই ইলেকট্রনগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লির (membrane) এক এনজাইম থেকে আরেক এনজাইমে গিয়ে ছোট একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ তৈরি করে, যা প্রোটনগুলোকে এক পাশে ঠেলে পাঠায়। অক্সিজেন যেহেতু উচ্চ বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন (high electronegativity), তাই এই ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের (electron transport chain) শেষ গন্তব্য হিসেবে কাজ করে। এটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং দুটি প্রোটন নিয়ে পানি তৈরি করে।

এই প্রক্রিয়ায় ঝিল্লির এক পাশে জমা হওয়া প্রোটনগুলো একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন চ্যানেলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, ঠিক যেন ছোট্ট কোনো জলবিদ্যুৎ বাঁধ। এই প্রোটিন, যাকে এটিপি সিন্থেস (ATP synthase) বলা হয়, টার্বাইনের মতো ঘুরতে ঘুরতে শক্তি উৎপন্ন করে যা অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) আকারে সঞ্চিত থাকে। কোষ এই শক্তি নিজের কাজে লাগায় অথবা শরীরের অন্য অংশে পাঠিয়ে দেয়।

বিকল্প কী ছিল?

জীব জগৎ অক্সিজেন ছাড়াও অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারে ইলেকট্রন গ্রহণকারী হিসেবে, যেমন সালফেট, নাইট্রেট বা আয়রন। কিন্তু অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি শক্তি দেয়।

একটি গবেষণাপত্রে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের অধ্যাপক ডেভিড ক্যাটলিং ও তার গবেষণা দল উল্লেখ করেছেন, "ইলেকট্রন স্থানান্তরের সময় অক্সিজেনের হ্রাস (reduction) সবচেয়ে বেশি ফ্রি এনার্জি মুক্ত করে, ফ্লোরিন আর ক্লোরিন বাদে।"

ফ্লোরিন অক্সিজেনের চেয়েও বেশি শক্তি দিতে পারে, কিন্তু সমস্যা হলো ফ্লোরিন যখন জৈব পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। তাই এটা জীবদেহে ব্যবহারের যোগ্য নয়। ক্লোরিনও একই রকম বিষাক্ত। ফলে অক্সিজেনের আরেকটি বড় সুবিধা হলো, অর্থাৎ এটি বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে না। অক্সিজেন ব্যবহার করে যে বিপাকীয় প্রক্রিয়া চলে (aerobic respiration), তাতে শুধু পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা শরীর সহজেই সামলাতে পারে।

তবে এর বিপরীত দিকেও কথা আছে। অক্সিজেন অতিরিক্ত হয়ে গেলে কোষের ভেতরের DNA, প্রোটিনসহ বিভিন্ন জৈব উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এজন্যই আমাদের শরীর "অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট"-এর সাহায্য নেয়, যা এই ক্ষতি থেকে কোষকে রক্ষা করে।

সহজলভ্যতা: অক্সিজেনের বড় শক্তি

ফ্লোরিন বা ক্লোরিনের তুলনায় অক্সিজেন অনেক বেশি সহজলভ্য। যেহেতু উদ্ভিদ ও শৈবাল প্রতিনিয়ত ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে, তাই এটি বাতাসে ও পানিতে প্রচুর মজুত থাকে। আর গ্যাস হিসেবে

অক্সিজেন ঝিল্লির মধ্য দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে, যেটা প্রাণের পক্ষে দারুণ সুবিধাজনক।
তাহলে প্রশ্ন ওঠে—বায়ুমণ্ডলের ৭৮% যেটা নাইট্রোজেন, সেটা কেন ব্যবহার করা হয় না?

অধ্যাপক ক্যানফিল্ড বলেন, "সমস্যা হলো নাইট্রোজেন একটি ত্রিবন্ধনে আবদ্ধ (triple bonded), আর এই বন্ধন ভাঙা খুবই কঠিন।" যদিও কিছু বিশেষ জীব আছে যারা প্রচুর শক্তি খরচ করে এই বন্ধন ভাঙতে পারে, এবং তা থেকেই জীব জগতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, কিন্তু সেটা সহজ ও স্বাভাবিক উপায় নয়।

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান: অক্সিজেনের বিশেষত্ব

অক্সিজেনের এই অনন্য গুণের পেছনে আছে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের খেলা। সাধারণ অবস্থায় অক্সিজেন একই স্পিনের (same spin state) ইলেকট্রন গ্রহণ করে, ইলেকট্রন জোড়া নয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি উচ্চ মাত্রায় জমে থাকা সত্ত্বেও দুম করে অতি বিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না, কিন্তু যখন একে একে ইলেকট্রন সরবরাহ করা হয়, তখন প্রচুর শক্তি ছাড়ে—যা আমাদের কাজে লাগে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের বিবর্তনীয় জীবরসায়নের অধ্যাপক নিক লেইন বলেন, "অক্সিজেনের আসল কৌশল হলো—এটা একসাথে না, বরং ধাপে ধাপে ইলেকট্রন গ্রহণ করে, ফলে প্রচুর শক্তি ছাড়তে পারে।"

তাই অক্সিজেন?

সব বিবেচনায় অক্সিজেন যেন এক "সুইট স্পট"-এ অবস্থান করছে। এটা ক্লোরিন বা ফ্লোরিনের মতো অতিরিক্ত বিক্রিয়াশীল না, আবার নাইট্রোজেনের মতো চরম স্থিতিশীলও না। সালফেট বা নাইট্রেটের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর শক্তির উৎস। এটি সহজলভ্য, পরিবহনযোগ্য, এবং বিপাক শেষে বিষাক্ত কোনো বর্জ্যও তৈরি করে না।

সবচেয়ে বড় কথা, উদ্ভিদরা প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য এই গ্যাসটি উৎপাদন করে চলেছে। আমরা শুধু এটাকে কাজে লাগাই, জীবনের ইঞ্জিন চালানোর জ্বালানির মতো করে।

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞানবার্তা

@bigganbartafb @bigganbarta @bigganbarta @bigganbarta

বিজ্ঞানবার্তা

bigganbarta.org